প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা

শ্রীশ্রীহর্ষ মল্লিক

পরিবেশক

পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৮৫

মুদ্রক
দেবী প্রেস । ৫৭/২ কেশব সেন ষ্ট্রীট । কলি-৯

প্রকাশক
শ্রীসমীর মুখোপাধ্যায় । ১২, শশিভূষণ ব্যানার্জী ষ্ট্রীট । কলি-৮

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
শ্রীমাণিক সরকার । শিল্পীলোক । কলেজ ষ্ট্রীট । কলি-৯

অলংকরণ
শিরোলিপি : অধ্যাপক শ্রীশংকর সোম, শান্তিপুর কলেজ, নদীয়া
পটচিত্র : শ্রীননীগোপাল চিত্রকর, নয়া, পিংলা, মেদিনীপুর
আলোকচিত্র : লাইট এ্যাণ্ড শেড, কল্যাণী, নদীয়া
ও অন্যান্য

নদীয়া জেলার

জলঙ্গী নদীর বাঁকে

হাঁসপুকুরিয়া গ্রামের

'মিলন'

মিলন দত্তের স্মৃতিতে

পরবর্ত্তী গ্রন্থ :

'লোকজীবন গ্রন্থমালা'র

দ্বিতীয় খণ্ড

'প্রসঙ্গ লোকগীতি'

মূল্যবান

ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সহ

ভূমিকা

কয়েক বছর আগে প্রকাশিত আমার একটি গ্রন্থ আগ্রহের সঙ্গে উৎসর্গ করেছিলাম—"খ্যাতি বা পুরস্কার কামনার উর্দ্ধে যাঁরা স্বেচ্ছায় উভয় বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে চিন্ময় বঙ্গের মহৈশ্বর্যসন্ধানে ব্যাপৃত, সেই অকীর্তিত, আদর্শবাদী, দেশপ্রেমী গবেষকদের উদ্দেশে।" বলা বাহুল্য, যে উৎসর্গ পত্রের প্রতিটি শব্দই ছিল সুনির্বাচিত এবং আমার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে সরাসরি উৎসারিত। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে এ হেন নিঃস্বার্থ গবেষক এখনও দুর্লভ। সেজন্য উল্লিখিত অভিলাষ পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখলে মন আনন্দে ভ'রে ওঠে।

আমাদের লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন—"দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয়, তবেই দেশ প্রকাশিত।" বাঙালির চির'যত জীবনচর্যার সুকুমার বৈশিষ্ট্যগুলি যে কত মহৎ ও ঐশ্বর্যময়, তার বিকাশের ধারা যে কত অভিনব ও ক্লান্তিহীন তা' ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। অথচ এই বিপুল সংস্কৃতিসম্ভার যেসব অসামান্য কুশলীর (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'প্রকাশমান মানুষ'-এর) অবদান, তাঁরা অজ্ঞাত, অখ্যাত, অবহেলিত থেকে বঙ্গ কৃষ্টি মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন বহুকাল। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের উত্তরসূরিরা পুরাতন ঐতিহ্যকে এখনও হয়ত কিছুটা বাঁচিয়ে রেখেছেন কায়ক্লেশে। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাঁদের ভবিষ্যতও অন্ধকার। এই নৈরাশ্যজনক অবস্থায় আমাদের সনাতন কাব্য-সাহিত্য-সঙ্গীত, আমাদের পালপার্বন-লোকাচার-কিংবদন্তী প্রভৃতিতে নিহিত অসীম ধনভাণ্ডারের উদ্‌ঘাটন এক জরুরি জাতীয় কর্তব্য। আর বিলম্ব হলে সে মহৈশ্বর্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ শুধু দুষ্প্রাপ্যই হবে না, উপাদানগুলিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বহু ক্ষেত্রে সে বিপত্তি এখনই উপস্থিত।

এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে কালেভদ্রে যখন কোনও গবেষকের দেখা পাই যিনি শহুরে পাঠাগারে বা গৃহকোণের সুলভ স্বাচ্ছন্দ্যে চর্বিতচর্বণের উপর সর্বাংশে নির্ভর না করে 'ক্লেশকর' সরজমিন অনুসন্ধানেও নিজেকে নিয়োজিত রাখেন, তখন আনন্দে মন ভরে ওঠে। বাঙালির লোকসংস্কৃতি তার গ্রামীণ জীবনেরই

ফসল। এবং সে চিরায়ত সম্পদের উপযুক্ত আহরণ ও বিশ্লেষণে ক্ষেত্রপরিক্রমাজাত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিকল্প আর কিছু আছে বলে মনে হয় না।

বর্তমান লেখক যে স্বেচ্ছায় "স্বান্তঃসুখায" সেই প্রার্থিত কষ্টস্বীকার করেছেন, তা এ গ্রন্থের নিবন্ধগুলিতে পরিস্ফুট। উপরন্তু, আলোচ্য বিষয়ে পূর্বপ্রকাশিত তথ্যেরও বিশদ সন্ধান তিনি দিয়েছেন কয়েকটি পাদটীকায়। তাঁর সন্ধিৎসা সাধারণতঃ বিশদ ; বিবরণ ভঙ্গীও সাবলীল। বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এ বইটি যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করলে সুখী হব। আমি লেখককে উৎসাহ দেব ক্ষেত্রানুসন্ধানজাত আরও অনুরূপ পুস্তক প্রণয়ন করতে এবং সম্ভব হলে, সেগুলিকে আলোকচিত্রশোভিত করতে, যাতে রচনাগুলি পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয় ও কিছু সমকালীন দৃশ্য-দলিলও রক্ষিত হতে পারে উত্তরকালের জন্য।

কলকাতা   অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১লা পৌষ,১৩৯১

(১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৪)

নিবেদন

'লোকজ্ঞান গ্রন্থমালা'র উন্মোচনী গ্রন্থরূপে 'প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা' প্রকাশিত হল। পরবর্তীকালে লোকগীতি, লোককথা, লোকবিশ্বাস, লোকশ্রুতি, লোকরচন, লোকউৎসব ইত্যাদি বিষয়ের প্রসঙ্গ গ্রন্থাকারে প্রকাশের সদিচ্ছা নিয়ে এই গ্রন্থমালার সূচনা হল।

'লোকচিত্রকলা'র বিশাল উদ্যান থেকে মাত্র দু'একটি পুষ্প চয়ন করে এ' মালা গাঁথা হয়েছে। পরবর্তীকালে কোন যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে এ ধারণা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে, এই আশা রাখি। তাই কেবলমাত্র দু'একটি প্রকরণই এই গ্রন্থে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে অন্যান্য প্রকরণও আলোচিত হয়েছে। স্বল্প-আলোচিত বিষয়ের ক্ষেত্রে কখনই কোন বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি—সেক্ষেত্রে পাঠকের মতামতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

লোকচিত্রকলা বিষয়ক গ্রন্থ সাধারণতঃ সচিত্র হওয়াই রেওয়াজ। কিন্তু আয়তন ও ব্যয় বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থটিকে যথেষ্ট অলংকৃত করা সম্ভব হল না। পরিবর্তে গ্রন্থের ভাষা, বিবরণ ও ব্যাখ্যা যতদূর সম্ভব চিত্রধর্মী করে তোলা হয়েছে।

গ্রন্থভুক্ত দু'টি নিবন্ধ ইতিপূর্বে 'হোম' ও 'চিত্রকল্প' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয়-সাদৃশ্য হেতু সেগুলি প্রয়োজনীয় পরিমার্জনাসহ গ্রন্থভুক্ত করা হল। অন্যান্য নিবন্ধগুলি গত পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতার নির্বাচিত সংগ্রহ।

ছাত্রাবস্থার সতীর্থ ও বর্তমানে লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক অধ্যাপক ডঃ বরুণ চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত প্রেরণাই এই গ্রন্থের সূচনা। লোকসংস্কৃতি ও পুরাকীর্তির অন্যতম গবেষক অগ্রজপ্রতিম শ্রীতারাপদ সাঁতরার সক্রিয় সহযোগিতা ও পরামর্শ এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রতিটি স্তরে জড়িত। লোকসংস্কৃতি ও পুরাকীর্তি গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে নিতান্তই শিক্ষানবীশ এই গ্রন্থকারকে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছেন।

তথ্য-সংগ্রহে, প্রেসের কাজে, গ্রন্থ-প্রকাশের নানা কাজে যার কাছে অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি—সেই তরুণ বন্ধুটি হল শ্রীমান রবীন কুণ্ডু। ব্যক্তিগত সম্পর্কের

ঘনিষ্ঠতার জন্য তাকে পৃথক ভাবে ধন্যবাদ জানালাম না। অন্যান্য বিষয়ে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে প্রবন্ধগুলি রচনার সময়ে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের নাম ও পরিচয় পৃথকভাবে লিখিত হল।

মুদ্রণ-প্রমাদ জর্জরিত এই গ্রন্থ হয়তো পাঠক ও সমালোচকের বিরক্তি অর্জন করতে পারে। তাই প্রচলিত রীতি বর্জন করে গ্রন্থারম্ভেই গ্রন্থের ক্ষতিকারক মুদ্রণ প্রমাদগুলির জন্য একটি শুদ্ধিপত্র সংযোজন করা হল। আশা করি গ্রন্থ-পাঠের পূর্বেই পাঠকবর্গ সেই নির্দেশ অনুসারে এগিয়ে যাবেন। এ' ব্যাপারেও যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে।

সব শেষে, 'দেবী প্রেসে'র সকল কর্মীদের মুদ্রণকার্য ছাড়াও অন্যান্য নানাবিধ কাজে সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের সক্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ কোনদিনই আত্মপ্রকাশ করতে পারত না।

এ গ্রন্থ বিশেষজ্ঞের জন্য লিখিত নয়। সাধারণ মানুষকে বঙ্গ ভাণ্ডারের বিবিধ রতনের প্রতি আগ্রহী করার জন্যই গ্রন্থকারের এই দীন প্রচেষ্টা। শুধু এই বিষয়মূল্যেই যদি গ্রন্থটি পাঠক সাধারণের আনুকূল্য লাভ করে, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক।

বড়দিন '৮৪ — বিনীত

ঠাকুরপুকুর, কলিকাতা ৬৩ — শ্রীশ্রীহর্ষ মল্লিক

সূচীপত্র

এক

আলপনা : পদ্ধতি ও প্রকরণ ॥ ১

দুই

সেঁজুতি ব্রতের আলপনা ॥ ১৫

তিন

পট পটুয়ার পাঁচালী ॥ ৩৮

চার

পটচিত্র, চলচ্চিত্র ও কমিকৃস ॥ ৫১

পাঁচ

যীশু পটের সন্ধানে ॥ ৬৫

ছয়

রবীন্দ্রনাথ ও লোকচিত্রকলা ॥ ৮০

সাত

সাহিত্যে লোকচিত্রকলা ॥১০৬

পরিশিষ্ট

এক

আলপনা চিত্রের তালিকা ॥ ১৩৯

দুই

লোকচিত্রকলা সংক্রান্ত গ্রন্থ ইত্যাদির তালিকা ॥ ১৪১

এক
[আলপনা : পদ্ধতি ও প্রকরণ]
'নেপালী আলপনা' ॥ ৭
দুই
[সেঁজুতি ব্রতের আলপনা]
'সেঁজুতি ব্রতের আলপনা' ॥ ৩২ পৃষ্ঠার সামনে
তিন
[সেঁজুতি ব্রতের আলপনা]
'বিভিন্ন লিপি ও সংকেত চিত্র' ॥ ৩৩ পৃষ্ঠার সামনে
চার
[যীশুপটের সন্ধানে]
'যীশুপট' ॥ ৭২ পৃষ্ঠার সামনে
পাঁচ
[সাহিত্যে লোকচিত্রকলা]
'কাজল রেখার আলপনা' ॥ ৭৩ পৃষ্ঠার সামনে

[লোকচিত্রকলার বিভিন্ন মোটিফ]

শান্তিনিকেতনী আলপনা ॥ ৯
হাতে পো কাঁখে পো ॥ ২৭, ১০৩
প্রচলিত আলপনা ॥ ৩৭, ১১০, ১১৯, ১২৫, ১৩৬
জড়ানো পট ॥ ৪০, ৫১, ৭৬, ৮৮, ১১৫
পটুয়ার রঙের বাটি ॥ ৪৩, ৫৮, ৭৪, ৯৯, ১২৮, ১৩৪
কালিঘাট পটের 'পো' ॥ ৫০, ৭২, ৯৯, ১২৩
মাটির ঘোড়া ॥ ৫৬, ১২৯
লোকচিত্রকলায় হাতী ॥ ৬২
লোকচিত্রকলায় ক্রুশ ॥ ৬৭
বাঁকুড়ার দশাবতার তাস ॥ ৬৯
রবীন্দ্রচিত্রকলার নমুনা ॥ ৮৬
সেঁজুতি ব্রতের মোটিফ ॥ ৯৪, ১২১

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ভোজরাজ শর্মা

সিকিউরিটি স্টাফ। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। নদীয়া

অরুণ কর

সম্পাদক, 'হোম'। কুলগাছিয়া। হাওড়া

অরুণকান্তি সরকার

অধ্যাপক, শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। নদীয়া

শম্ভুনাথ রায়

শিক্ষক, কেশবপুর উচ্চ বিদ্যালয়। হুগলী

শক্তি বসু

সম্পাদক, 'চিত্রকল্প'। ২, জওহরলাল নেহরু রোড। কলি-১৩

স্বপন পাত্র

শিক্ষক, হ্যামিলটন স্কুল। তমলুক। মেদিনীপুর

কাজল মহান্ত

সম্পাদক, 'নান্দনিক' সাংস্কৃতিক সংস্থা। কল্যাণী। নদীয়া

বিনয় ঘোষ

প্রকাশক, 'বুক হাউস'। ৩, রামকান্ত মিস্ত্রী লেন। কলি-৯

আবদুল ওদুদ

অধ্যাপক, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। ব্যারাকপুর। ২৪ পরগণা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৮	ডেরিয়ার	ভেরিয়ার
৩	১২	সেঝেতে	মেঝেতে
৫	১৭	রংঙের	রঙের
৭	৬	পয়িকল্পনা	পরিকল্পনা
৭	৭	রেথাটিকে	রেখাটিকে
১৮	১৫	পূর্বোক্তন কশা	পূর্বোক্ত নকশা
২২	২০	বেডী	বেড়ী
৩৩	১৫	ইতিহাকে	ইতিহাসে
	৬	পদ	পট
৪৬	৮	ঐতিহ্যশ্রয়ী	ঐতিহ্যাশ্রয়ী
৪৮	৯	মোণ্টামুটি	মোটামুটি
৭২	২৭	ক্রুশারোহা	ক্রুশারোহণ
৮২	৩	লোকসংস্কৃতি	লোকসংস্কৃতি
৮৩	১৩	লৌকিক	লৌকিক
৮৫	২৯	মহাশষ	মহাশয়
৯২	২৫	রবীন্দ্রনাধ	রবীন্দ্রনাথ
৯৩	১৫	শিল্পরসিকরা	শিল্পরসিকরা
৯৪	১	তেননি	তেমনি
৯৬	২	শিল্পসত্তার	শিল্পীসত্তার
৯৬	১০	বাংসার	বাংলার
১০০	১৫	অ্যাবস্ট্যাক্ট	অ্যাবস্ট্র্যাক্ট
১০৮	২০	আঁচল	আঁচড়
১১৩	৩	পণিচ্ছেদে	পরিচ্ছেদে
১১৫	৪	াজনস্থান	জনস্থান
১২১	১৯	আসবেন	আসিবেন
১২৮	৩	পুতেল	পুতুল

প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা

আলপনা : পদ্ধতি ও প্রকরণ

এক

বিভিন্ন পাল-পাবণ পূজা-উৎসবাদিতে আলপনা দেওয়ার প্রথা আজ প্রায় উঠে যেতে বসেছে—এর মূল কারণ, ঐ সব ব্রত-পূজা-পাল পার্বণই আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। ব্রতর সঙ্গে আলপনার যে একটা অতি নিকট সম্বন্ধ এবং দুটিকে পৃথক করে দেখা যায় না—সে কথা আজ আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।

আলপনা কি বা কেন, কিভাবে তার উৎপত্তি, প্রসার ও বিবর্তন ইত্যাদি তত্ত্বে না গিয়ে, এর অংকন পদ্ধতি নিয়ে প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাক। কিভাবে আলপনা দেওয়া হয়, তা এতই জটিল ও সেই সঙ্গে এতই সরল—যে অতি সরল লোকও তা জটিল বলে ভাবতে পারেন এবং কখনও বা অতি জটিল মনের কাছেও তা সরল হয়ে উঠতে পারে

আলপনা বিষয়ে যে সকল পুস্তক এ যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি সংখ্যায় নেহাৎ কম নয়। একটি খাঁটি লোকচিত্রকলা প্রচারের জন্য এতগুলি গ্রন্থ প্রকাশ—রীতিমত গর্বের বিষয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুশর্মা, দুর্গা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিদের গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও গুরুসদয় দত্ত, অজিত মুখোপাধ্যায়, অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিল্পসম্মত আলোচনা করেছেন। নৃতাত্ত্বিক ভেরিয়ার এলউইন সাহেব এবং শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুও এ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুতরাং আলপনা ব্যাপারটি শিক্ষিত সংস্কৃতিমনস্ক জনসমাজে এখন বহুল ভাবেই প্রচারিত।

উপরোক্ত তালিকা পূর্ণাঙ্গ অথবা অপূর্ণাঙ্গ—এ নিয়ে কোন প্রশ্ন নয়। সমস্যা হল, আলপনা সম্বন্ধে যত প্রকার বৈচিত্র্যপূর্ণ সংবাদ এঁরা সবাই উল্লেখ করেছেন—দুঃখের বিষয়, আলপনা দেওয়ার প্রথা বা পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন গ্রন্থকার বা প্রবন্ধকারই তেমন বিশদ ভাবে আলোচনা করেন নি। যদিও সেটা এই ধরনের চিত্রকলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থে ব্রতের উদ্‌যাপন সম্বন্ধে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা থাকলেও, গ্রন্থারম্ভের ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

'পবিত্র ভাণ্ডে পলিপড়া গঙ্গাজল, ইহাতে আমাদের সাহিত্যের এক স্তব, প্রত্নতত্ত্বের বালু কণা, ভারতীয় শিল্পকলার কতকগুলি চিহ্ন এবং মোছা মোছা কোমল আঁচল—(যাহা ইউরোপীয় জ্যামিতি কুলকে সহজেই স্তব্ধ করিয়া দিতে পারে* ।)' এই তারকা চিহ্নিত পংক্তি কটি হল, 'শুধুই অঙ্গুলীর চালনায়' যে সমস্ত আলপনা মেয়েরা অতি সহজে অংকিত করিয়া থাকেন, ব্রতের একপ একটি আলপনার প্রতিলিপি অংকন করিতে গিয়া একজন ইয়োরোপীয় চিত্রকরকে কম্পাস, সেট স্কোয়ার ইত্যাদি লইয়া গলদঘর্ম হইতে হইয়াছিল।

অংকন পদ্ধতি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের নির্দেশটি সংক্ষিপ্ত হলেও কার্যকরী। মনে রাখতে হবে, ঐ গ্রন্থের প্রকাশ কাল ১৩ ৮ সাল। তার আগে আর কেউ লিখিত ভাবে আলপনা অংকন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন কি না তা জানা নেই। দক্ষিণারঞ্জন বলেছেন :

'আ'ল চাল ভিজিয়ে নিয়ে তাই বেঁটে পিটুলী তৈরার করবে। পিটুলী একটু শুকনো শুকনো হবে, তা বাটি করে অল্প একটু জলে গুলে নিলেই আলপনা দেওয়ার মত পিটুলী হবে। এক টুকরো নেকড়া পিটুলীতে ভিজিয়ে আঙ্গুল দিয়ে আলপনা আঁকবে। আলপনা রোজ রোজ নতুন করে আঁকবে।'

উপরের বিবরণ থেকে আলপনার অংকন পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণাটি পাওয়া যায়। কিন্তু এ ছাড়া আর যে সব গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখকের নাম ইতি-পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, সেখানে কিন্তু এর চেয়ে বেশী কারিগরী বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবু অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে ব্রতকথার আলপনার সঙ্গে কিছুটা পদ্ধতিগত আলোচনা করেছেন, বিষ্ণুশর্মার গ্রন্থটিও প্রায় অনুরূপপন্থী।

এবিষয়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি হল ডঃ কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধটি : 'সুশুভ্র আতপতণ্ডুল শিলে পিষে পিটুলী তৈরী করে তাই দিয়ে গোবর দিয়ে নিকানো মাজা মেঝের উপর অত্যন্ত সুন্দর করে এক টুকরো ন্যাকড়াকে বা কেবল আঙ্গুলকে তুলির মত ব্যবহার করে স্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে মেয়েরা আলপনা আঁকতেন অত্যন্ত একাগ্র ভাবে। আশ্চর্য ছিল তাঁদের রেখাংকনের নির্ভুল কৌশল—অনেকটা সহজাত সংস্কার থেকে পাওয়া।'

অংকন পদ্ধতির এই রূপরেখা থেকে এটুকু স্পষ্ট যে, দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন মূলতঃ সংকলক মাত্র। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী হলেও মূলতঃ আলপনা শিল্পী নন। ডঃ কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় লোকসংস্কৃতির গবেষক—সঙ্কলক বা শিল্পী নন। অন্যান্যদের কথা এ প্রসঙ্গে আসতেই পারে না।

সেদিক থেকে দুর্গা মুখোপাধ্যায়ের 'আলিম্পন' গ্রন্থটি আমাদের অনেক প্রত্যাশা পূরণ করে। অংকন পদ্ধতির জটিলতা তিনি অতি সরলভাবে প্রকাশ করেছেন। সম্ভবতঃ তিনি আলপনা-শিল্পী বলেই হয়তো, অংকনের নানা খুঁটিনাটি শিল্পী-সুলভ মন নিয়ে তুলে ধরতে পেরেছেন। বড় আয়তনের এই গ্রন্থটিতে তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় অংকন-পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ গুলিকেই প্রায় দীর্ঘ দু' পৃষ্ঠা ধরে বর্ণনা করেছেন। সেই বিশদ বিবরণের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

'আমাদের সনাতন আলপনা কিন্তু মেয়েরা হাতের আঙুলে আঁকতেন। এক টুকরো নেকড়া পিটুলীর জলে ভিজিয়ে নিতে হবে। চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ও দু-তিন ইঞ্চি চওড়া হলেই চলে। নেতা বুলিয়ে ঘর মোছার মতো। ভেজা নেকড়াটুকু মেঝেতে ঘষে লাইন টানা নয়, সেটা হাতের তেলোয় আলগোছে ধরে রাখা হয়। তাকে ইচ্ছামতো চাপ দিলে অর্থাৎ কড়ে আঙুলের আগের আঙুল—ইংরাজীতে যাকে বলে Ring Finger, সেই আঙুল বেয়ে নেকড়া থেকে পিটুলী জল গড়িয়ে আসে। ভেজা আঙুলের ডগা দিয়ে মেঝেতে বা দেয়ালে আলপনা আঁকা হয়। আঙুলের টান কম বেশী হওয়ার উপরে আলপনার লাইন নিখুঁত হওয়া নির্ভর করে। আঙুলটা খুব ধীরে ধীরে চালালে, পিটুলীর জল বেশী গড়িয়ে লাইনটা মোটা হবে। একই জায়গায় থেমে থাকলে টপ করে খানিকটা সাদা জল সেখানে পড়ে বিশ্রী দেখাবে। আর খুব তাড়াতাড়ি আঙুল চালালে নেকড়া থেকে গড়ানো জল তার সঙ্গে তাল রাখতে পারবে না। লাইনের দাগ স্পষ্ট হবে না। ঠিক কতটা তাড়াতাড়ি বা ধীরে আঙুল চালালে হয়, সেটা অভ্যাসের ফলে মেয়েরা নিজেরাই বুঝতে পারে।'

কি সরল, সুন্দর ও বিশদ বর্ণনা। পড়েই বোঝা যায় এর লেখিকা নিজেই একজন শিল্পী। তাই এত সরল ভাবে এর জটিলতা প্রকাশ করতে পেরেছেন। এত সুন্দর ব্যবহারিক বর্ণনা আর কোন গ্রন্থকারই দেননি।

প্রধানতঃ অবাঙ্গালী পাঠকের জন্য বৃহত্তর ভারতের পটভূমিতে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ একদা প্রকাশ করেন ভারত সরকারের পাবলিকেশন ডিভিশন, এখন থেকে প্রায় বাইশ বছর আগে। নানা ধরনের আলপনা ও অংকন-পদ্ধতির সামান্য উল্লেখ সেখানে থাকলেও, পিটুলী-গোলা পদ্ধতি সম্বন্ধে তাতে একটু বিশদ বর্ণনা ছিল। অন্ততঃ অবাঙ্গালী সম্প্রদায় এই পদ্ধতি সম্বন্ধে তাতে নিশ্চয়ই কিছুটা উপকৃত হতে পারেন। সেখানে গ্রন্থকার লিখেছিলেন :

'The media materials required for Alpana are simple and very few. A handful of sunned rice (atap chaul) and a small piece of cloth are the basic requirements for painting an Alpana. The rice is moistend with water and made into thick paste, Enough water is added to obtain a paste of proper consistency to facilitate the drawing of lines. The piece of cloth is immersed in the paste, held in the lower part of the palm (or at the root of the fingers) and the paste is released and allowed to trickle down the [illegible] which moves along to make the design.'

কিন্তু শিক্ষিত শহুরে লোকের জন্য এই [illegible] ব্রাশ আর বাটী [illegible] রং দিয়ে আলপনা আঁকার [illegible] করেছেন।

ঐ গ্রন্থে আলপনা অংকনে রত একটি হাতের চিত্রও সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে শিক্ষানবীশের পক্ষে এর অংকন পদ্ধতির তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভও সম্ভব।

এ বিষয়ে দীনেন্দ্র কুমার রায়ের 'পল্লীচিত্র' গ্রন্থে 'লক্ষ্মীপূজা' শীর্ষক স্মৃতিচিত্রটি প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে কিছুটা কাজে আসতে পারে। তবে উপরোক্ত গ্রন্থগুলিতে আলপনার আঁকার রীতি-প্রকরণ সম্বন্ধে যতটা তত্ত্বগত জ্ঞান বাড়ে, সে ভাবে নয়।

অনুরূপ মন্তব্য করা যায়, দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের ময়মনসিংহ-গীতিকার পালা অবলম্বনে রচিত 'কাজলরেখা' কাহিনীর সম্বন্ধেও। এখানে আলপনা দেবার একটি বিশদ বিবরণ আছে এবং তা বেশ নাটকীয় ও শিল্পমণ্ডিত। তবে

প্রাথমিক শিক্ষার্থার ক্ষেত্রে এটি তাদের উপকারে আসবে না। এই বিবরণটিকে কিছু পরিমাণে আলপনা রচনার ফলিত শিল্পরীতি বলা যেতে পারে।

অবশ্য এটা ঠিকই যে উপরোক্ত গ্রন্থ দুটি আলপনা রচনা শিক্ষা দেবার জন্য লিখিত হয়নি। প্রথমটি লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণরূপে এবং দ্বিতীয়টি আখ্যান রচনার অংশরূপে আলপনা রচনার প্রসঙ্গ এসেছে। আধুনিক কালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট অংশ সম্বন্ধেও ঐ একই মন্তব্য করা যেতে পারে।

দুই

উপরোক্ত চিরাযত পদ্ধতি ছাড়াও আলপনা অংকনের আরো কিছু পদ্ধতি প্রচলিত আছে—সেগুলি এ দেশের এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত। পশ্চিমে গুজরাট অঞ্চলে ও দক্ষিণে তামিলনাডু অঞ্চলে পিটুলী গোলার ব্যবহার তেমন প্রচলিত নয়। তাই, সে আলপনার বহিঃরূপও এদেশীয় আলপনার মতো নয়। পরিবর্তে সেখানে আলো চাল গুঁড়িয়ে সাদা পাউডার তৈরী করা হয় এবং সেটিই হাতের মধ্যমা-তর্জনী-বৃদ্ধ—এই তিন আঙ্গুলের মধ্যে অল্প করে নিয়ে তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে খুব নিপুণ ভাবে এবং দ্রুত হাতে ছড়িয়ে দিয়ে নক্সা টানা হয়। ভিজা গোবর লেপা মেঝের উপর সেগুলি বেশ আটকে যায়।

মধ্যপ্রদেশের মাণ্ডু, ধার, উজ্জয়িনী প্রভৃতি অঞ্চলেও এই ধরনের আলপনা দেওয়া হয়—তবে সেখানে নানা রংঙের গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়। এগুলি সাধারণতঃ নানা ধরনের পাথর ও মাটি থেকে সংগৃহীত হয় ও হাটে বাজারে সুলভে পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ও দেশের আলপনার ডিজাইনও কিন্তু এ দেশের পিটুলী গোলার নকশার মতো নয়। এদেশে বৃত্ত, বর্গ বা আয়তক্ষেত্র, ত্রিভূজ প্রভৃতি প্রাথমিক একটি জ্যামিতিক ক্ষেত্র তৈরী করে তার মধ্যে ও বাইরে নানা ধরণের ফুল-লতা-পাতা ও আনুষঙ্গিক অলংকরণে ভতি করা হয়।

কিন্তু দক্ষিণী বা পশ্চিমী ডিজাইন মূলতঃ জ্যামিতিক নকশার মত। তাই সেখানে চাল বা রং গুঁড়ো দিয়ে নকশা আঁকা অপেক্ষাকৃত সহজ। তবে লক্ষণীয় যে, কোন ক্ষেত্রেই লাইনগুলি বেশী সরু বা মোটা হয়ে যায় না—গুঁড়ো ছাড়ার

ব্যাপারে আঙুলের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা খুবই উল্লেখযোগ্য। পিটুলী ও নেকড়া নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে তা খানিকটা তুলনীয় হতে পারে। তবে চিত্রবিদ্যার নিয়মানুসারে একে 'আলপনা আঁকা' অপেক্ষা 'আলপনা দেওয়া' বলাই বোধহয় অধিক সঙ্গত।

চালের গুঁড়ি দিয়ে দক্ষিণ দেশে আর এক জাতীয় আলপনা আঁকার প্রথা আছে, তবে সেটা গ্রাম অপেক্ষা শহরাঞ্চলেই বেশী দেখা যায়। কিছুদিন আগে দক্ষিণ কলকাতার কোন কোন অঞ্চলে এই জাতীয় আলপনা আঁকার উপকরণ বিক্রী হতে দেখা যেত।

বস্তুটা হল: একটা এক-মুখ ফাঁপা বাঁশের নল, তার দৈর্ঘ প্রায় এক ফুট পর্যন্ত হতে পারে, কমপক্ষে ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত—ব্যাস খুব কম হলে আধ ইঞ্চি। এর গায়ে লোহার শিক পুড়িয়ে অসংখ্য ছিদ্র করা হয়েছে। সেগুলি এমন ভাবে করা হয়েছে যে গোল হয়ে ঘুরলে একটি সংক্ষিপ্ত নকশার আদল তৈরী হয়। ভিতরে ঐ ফাঁপা অংশে শুকনো চাল-গুঁড়ো আলগা করে ভরে মেঝেতে ঐ নল গড়িয়ে দিলে, ঐ ছিদ্র দিয়ে তা গড়িয়ে যেতে যেতে বেশ সুন্দর একটা নকশা সৃষ্টি করে। তবে ঐ নলটি চাল-গুঁড়ো দিয়ে টাইট করে ভরলে গুঁড়ো বেরুবে না।

কখনও কখনও এতে শুকনো আতপ চালের গুঁড়ির পরিবর্তে চক্‌খড়ির গুঁড়োও ভরা হয়। চালের গুড়ো ঝরঝরে শুকনো না হলে নকশা ভাল হবে না।

আলপনা দেওয়ার এটি যে একেবারে যান্ত্রিক পদ্ধতি—তা বলাই বাহুল্য। এ ধরনের নকশায় শিল্পীর মনের ইচ্ছানুযায়ী অংকনের সুযোগ কম। এর দ্বারা আলপনা দেবার 'দায়' থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শিল্পীর মন তৃপ্ত হয় না। এর বৈচিত্র্যও অনেক কম। বৃত্ত, ত্রিভুজ ইত্যাদি কোন আয়তনই নয়—আয়তাকার এবং শুধু আয়তাকার রূপেই এটি আঁকা হবে। কেননা চাল-গুঁড়ো ভরা নলটা মাটিতে গড়িয়ে দিলে তার দ্বারা অন্য কোন জ্যামিতিক ক্ষেত্র তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। তবে বারন্দার ধার দিয়ে শাড়ীর পাড়ের মত আলপনা দেওয়ার পক্ষে এই যন্ত্রটি বেশ উপযোগী।

এইসব আলপনাগুলি সূক্ষ্ম বিচারে যে অংকন নয়, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হাতে আঁকা এক ধরনের আলপনার কথা বলা যেতে

পারে, যার বহুল প্রচলন আছে উত্তরবঙ্গের নেপালী ভুটিয়া সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চলের জন সমাজে।

কোন প্রকার সাদা গুঁড়ো দিয়ে নয়, সুস্পষ্ট একটি রেখাকে একাদিক্রমে হাত না উঠিয়ে বিভিন্ন আকারে টেনে একটিমাত্র নকশা আঁকার ধরণ—এই হল উত্তর বঙ্গের নেপালী-ভুটিয়া জনসংস্কৃতির আলপনা আঁকাব বৈশিষ্ট্য। আলপনা আকার সময় কোন স্কেচ জাতীয় পূর্ব পরিকল্পনা করা হয় না। খুব সাবলীল হাতে রেখাটিকে এঁকে বেঁকে ঘুরিয়ে নেওয়া হয়। একমাত্র শিল্পীই

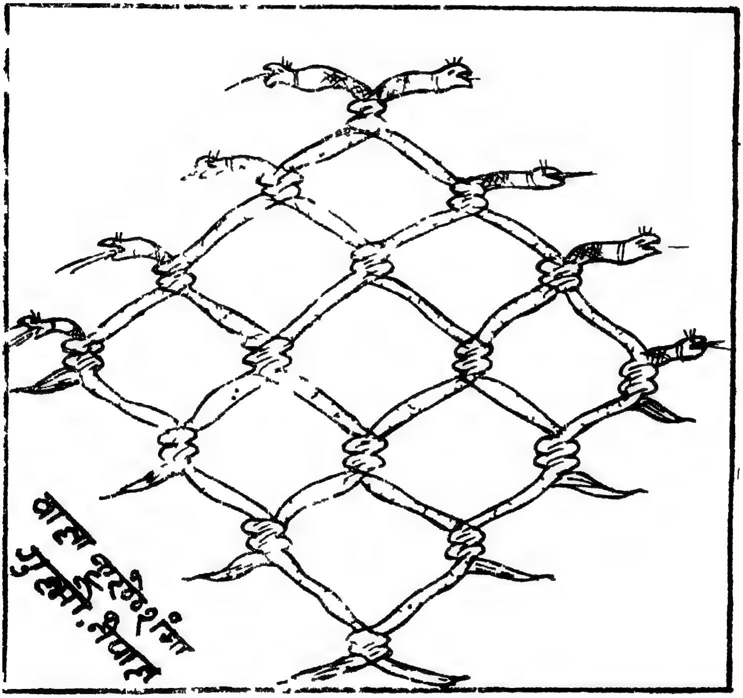

বলতে পারেন এই ঘূর্ণিত রেখার দ্বারা শেষ পর্যন্ত কি চিত্র হবে—রেখাটি সমস্ত পথ পরিক্রমা করে যখন আরম্ভের কেন্দ্রে এসে মিলিত হয়—তখন প্রায়শই যে চিত্রটি অংকিত হয় তা' হল: জোড়া জোড়া সাপ। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, এই অঞ্চলের অধিকাংশ আলপনার বিষয়বস্তুই হল এইটাই—তা সে যে ভাবেই আঁকা হোক না কেন।

নকশাগুলি সাধারণতঃ চার কোনা বা ছ' কোনা হয়—এবং সেখানে অনেক জোড়া সাপ থাকে, গায়ে গায়ে পরস্পর পেঁচিয়ে জড়িয়ে।

এদের আলপনায় সাপের এত আধিক্য কেন—এ' কথার জবাব পেতে গেলে হয়তো অনেককেই উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় লৌকিক দেবী 'বিষহরি'র কথা স্মরণ করতে হবে—যিনি দক্ষিণবঙ্গের মনসার নামান্তর মাত্র!

পাহাড়ী জাতির ধর্মীয় চেতনা যে ধরণেরই হোক, তারা যে সমতলবাসীর প্রতীক ও রূপকল্পনাকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেনি, আলোচ্য নকশাটি তারই প্রমাণ। অপর পক্ষে সংস্কৃতির অবাধ ও সরল মিশ্রণের ফলেও এমনটা হওয়া সম্ভব।

শুধু মাত্র পিটুলী-গোলা, চক-খড়ির গুঁড়ো বা একটি রেখায় আঁকা চিত্র দিয়েই যে আলপনা আঁকা হয়, তা নয়। এর পদ্ধতি যে দেশ-কাল ভেদে আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ, তা ময়মনসিংহের গ্রামের উঠোনে দাঁড়ালেই বোঝা যাবে।

মাঘ-মণ্ডল ব্রতের সময় এখানকার মেয়েরা এক অদ্ভূত প্রথায় আলপনা দেয় বা আলপনা রচনা করে। এর মূল উপকরণ হল নানা রংয়ের শস্য। বর্ণ বৈচিত্র্যের জন্য ধান, মুসুর, সরিষা, মাষ-কলাই প্রভৃতি নির্বাচন করা হয়।

কাঁচা অথবা পাকা বেল ফাটিয়ে, তার মধ্য হতে আঠা বের করে ঐ সব শস্যগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে হাত দিয়ে মাখানো হয়। বেলের আঠা বর্ণহীন স্বচ্ছ হওয়ায় আঠা মাখানোর ফলে শস্যগুলির নিজস্ব বর্ণ নষ্ট হয় না।

ইতিপূর্বে প্রশস্ত অঙ্গনে গোবর লেপা দিয়ে মোটামুটি ভাবে একটি নকশা স্কেচ করে রাখা হয়। তার ওপর ঐ সব আঠা মিশানো শস্যগুলিকে হাত দিয়ে দিয়ে যথাস্থানে পরিকল্পনা অনুযায়ী বসিয়ে দেয়া হয়—এই কাজ করার সময় শস্যগুলির বর্ণ সম্বন্ধে শিল্পীকে সজাগ থাকতে হয়। তাই ধানের পাশে সরিষা, তার পাশে মুসুর ও সব শেষে মাষ-কলাই—এক বিচিত্র বর্ণ-সুষমার সৃষ্টি করে। সর্বোপরি, আলপনার মূল নকশার মনোহারিত্ব তো আছেই।

ঐ একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে গ্রামের মেয়েরা আরেক ভাবে আলপনা রচনা করেন। এক্ষেত্রে শস্যগুলিকে আঠা মাখামাখি করে পরিষ্কার মাটির মেঝেতে আলপনার নকশা অনুযায়ী আঠা দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর পূর্বোক্ত ধরণের নানা বর্ণের শুকনো শস্য তাদের বর্ণ-বৈচিত্র্য অনুযায়ী ঐ আঠালো রেখার ওপর ছড়িয়ে দেয়া হয়। সব শেষে আঠা শুকিয়ে গেলে ওপরে বাতাস

বা মৃদু ঝাঁট দিলে অতিরিক্ত আলগা শস্যগুলি সরে যায় এবং মূল আলপনাটি দৃশ্যমান হয়।

স্থান ভেদে আলপনার নানাবিধ নাম প্রচলিত আছে কিন্তু তার দ্বারা পদ্ধতির পরিবর্তন সূচিত হয় না। আলোচ্য প্রবন্ধ কেবলমাত্র, পদ্ধতিগত বৈচিত্র্যের আলোচনার জন্যই, তাই এখানে বিভিন্ন নামের অবতারণা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

তিন

আলপনা দেওয়া বা আঁকার সূচনা কবে হয়েছিল, সে তত্ত্ব নিরূপণ করবেন নৃতাত্ত্বিক। কিন্তু তাকে বিভিন্ন ভাবে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন করে ব্যবহার করার যে প্রচেষ্টা, তা একই সঙ্গে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোচনার বিষয় মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, শান্তিনিকেতনী আলপনার প্রসঙ্গ এখানে করা চলে।

বর্তমানের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় গ্রামের সংস্কৃতির বিবর্তিত রূপটি প্রায়ই নাগরিক মনকেও তৃপ্তি দিতে পারছে—এ সত্য বহু সময়েই দেখা গেছে। আলপনার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি।

পদ্ধতির কিঞ্চিৎ মাত্র পরিবর্তন হলেও, বিষয়বস্তুর যথেষ্ট বিবর্তন হয়েছে আলপনা আঁকার ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে শান্তিনিকেতনী ধারার অবদান বিস্ময়কর ভাবে উল্লেখযোগ্য। অতিশয়োক্তি না করেই বলা চলে, শান্তিনিকেতন যদি না এই গ্রামীণ চিত্রকলাটিকে সেদিন সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম রূপে গ্রহণ করত—তবে এতদিনে তার স্থান হয়তো মিউজিয়মেই হয়ে যেতো। গ্রামীণ চিত্রকলার অন্তর্নিহিত সম্পদ তার শিল্প-সুষমা ও নান্দনিক অভিব্যক্তি। এগুলিকে সার্থক ভাবে কাজে লাগিয়ে তাকে যুগোপযোগী করে তুলে নাগরিক মনের কাছাকাছি নিয়ে আসার যে প্রচেষ্টা, তা করেছে শান্তিনিকেতনী শিল্পধারা- এ কথা মেনে নিতেই হবে।

এক্ষেত্রে পদ্ধতির পরিবর্তন তেমন একটা হয়নি। এমন কি কাঁচামাল বা উপকরণের ক্ষেত্রেও প্রায় পুরাতন ধারাটিই জিইয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে। তবে

শ্রম ও সময় সংক্ষেপ, দক্ষতার অভাব—প্রধানতঃ এই দুটি কারণে এখন পিটুলী গোলার পরিবর্তে জিংক অক্সাইড বা চক গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়। অপর পক্ষে, পিটুলী ভেজা নেকড়া দিয়ে আলপনা দেওয়াটা একটি সূক্ষ্ম দক্ষতার কাজ। সেটা একালের শিল্পীরা আয়ত্ত করতে না পারায়, এখন দামী ছবি আঁকার ব্রাশ ব্যবহার হচ্ছে।

পুরাতন আলপনাকে কি ভাবে নবসাজে সজ্জিত করে আধুনিক আলপনা রচিত হচ্ছে, তার নিদর্শন কিছু কিছু তুলে ধরেছেন এ কালের গবেষকগণ। এঁদের মধ্যে দুর্গা মুখোপাধ্যায়ের এবং ভারত সরকারের পাবলিকেশন ডিভিশনের আলপনার বইয়ে যে ভাবে চিত্রের উদাহরণসহ এ তত্ত্বটি বোঝান হয়েছে, তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুরোনো প্রথার নবীকরণ ছাড়াও, শান্তিনিকেতনী সংস্কৃতি আর এক নতুন ধারা আলপনায় প্রবর্তনের চেষ্টা করেছে। ছবি আঁকা ব্যাপারটি যে শুধু রং তুলি নির্ভর নয়, তা এর দ্বারা আর একবার প্রমাণিত হয়েছে। ইতিপূর্বে গ্রামীণ পরিবেশে রং তুলি বা পিটুলী-নেকড়ার পরিবর্তে অন্য ধরনের আলপনা রচনার যে উল্লেখ করা হয়েছে, এটি তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। সেটি হল :

শান্তিনিকেতনে প্রথম চাষ বা 'হলকর্ষণ' উৎসব উপলক্ষে মাঙ্গলিক চিহ্ন স্মরণে আলপনা দেওয়া হয়। ময়মনসিংহে যেমন নানাবিধ শস্যের সহযোগে আলপনা রচনা করা হয়—এখানে তেমনি শুধু শস্য নয়, নানাবিধ সব্জি ফল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন শস্য, সব্জি ও ফল-এর স্বাভাবিক বর্ণ বৈচিত্র্যে আলপনাটি বর্ণোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পৃথক কোন রং এর জন্য ব্যবহৃত হয় না।

এ উৎসব সাধারণত খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। তাই নীল আকাশের নীচে এই নিতান্ত প্রাকৃতিক পদ্ধতির আলপনা অত্যন্ত সার্থক ভাবে 'বন্যেরা বনে সুন্দর' প্রবাদের উদাহরণ হয়ে ওঠে। যেহেতু এই অনুষ্ঠান হয় বর্ষাকালের প্রারম্ভে, তাই উৎসব চলাকালীন সময়ে যখন তখন বৃষ্টি আসতে পারে। এই আলপনা রোদ-ঝড়-জল উপেক্ষা করতে পারে, যা—চিত্রিত আলপনার পক্ষে সম্ভব নয়। পরন্তু এই ধরণের আলপনা অতি অল্প সময়ে রচিত বা প্রয়োজন

বোধে পুনর্বিন্যস্ত হতে পারে। তাই কৃষি সংক্রান্ত হলকর্ষণ অনুষ্ঠানের সঙ্গে কৃষি উৎপাদন দিয়ে আলপনা রচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আলপনা দেবার আর এক বিচিত্র পদ্ধতি দেখা যায় শহুরে অঞ্চলে। যেখানে মুক্ত অঙ্গনে অমসৃণ ক্ষেত্রে বিশালায়তন আলপনার প্রয়োজন এবং যে অনুষ্ঠান ঠিক বিশুদ্ধ মাঙ্গলিক নয়, কিছুটা সাংস্কৃতিক—সেখানে এক নতুন উপকরণ দিয়ে আলপনা রচনা করা হয়। আলপনা যে এখন শুধু মাঙ্গলিক ক্রিয়া-কর্মের জগৎ থেকে আরো বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে এবং ক্রমেই তার চাহিদা বেড়ে চলেছে—এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মুক্ত অঙ্গন, অমসৃণ ক্ষেত্র, বিশালায়তন এবং বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এটি সাধারণতঃ দুভাবে চিত্রিত হতে দেখা যায়—প্রথমতঃ চুন, সুরকী, ঘেঁষ, বালি, ছোট ছোট পাথর কুচি—এগুলি মূল উপকরণরূপে ব্যবহার করে কোন দেবী বা বৃক্ষ বা মূর্তিকে কেন্দ্র করে আলপনা রচিত হয়। গৃহ নির্মাণের এই সামগ্রীর বিবিধ বর্ণ বৈচিত্র্যের সুষম বিন্যাসে ঐ আলপনাটি সহজেই বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। দূর থেকে দেখলে এটি যেন সাদা-কমলা-কালো-হলুদ-কালো বর্ণ রচিত এক প্রাকৃতিক আলপনা বলে মনে হয়।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর হাতে-গড়া শিষ্য প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি তর্পন প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী পত্রিকার নন্দলাল বসু, সংখ্যায় বলেছেন: 'শ্রীনিকেতনের হলকর্ষণ উৎসবের শস্যের এবং চুন-সুরকির আলপনা এবং বার্ষিক উৎসবের ও শিল্পোৎসবের রঙিন আলপনা এবং শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষ, বৃক্ষরোপণ উৎসব, সমাবর্তন, বসন্তোৎসব প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে বিচিত্র আলপনা রচনায় এবং সভাসজ্জায় মাষ্টার মশাইয়ের প্রবর্তিত রীতি তাঁর পুত্র-কন্যা এবং ছাত্রছাত্রীরা আজও অনুসরণ করে বিদগ্ধ সমাজকে মণ্ডনশিল্পের সার্থক উদাহরণ দেখাচ্ছেন এবং সর্বসাধারণকে আনন্দ দিচ্ছেন।'

এর দ্বিতীয় প্রকরণটিও উপকরণ বৈচিত্র্যের জন্যই বিশিষ্ট। এক্ষেত্রে কাঠের গুঁড়ো বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে প্রচলিত প্রথায় আলপনা রচনা হয়। লক্ষণীয় যে সর্বক্ষেত্রেই নকশা তৈরীর ব্যাপারে ঐতিহ্যকে অনুসরণ করা হয়। এমন কি শান্তিনিকেতনের হলকর্ষণ উৎসবের শস্য, সব্জী দ্বারা রচিত আলপনাতেও। তফাৎ হয় শুধু উপকরণের। উপকরণের পার্থক্য হলে যে আলপনার পার্থক্য হবে, এতো বলাই বাহুল্য মাত্র।

অনুরূপভাবে, দেব মন্দিরে বা তজ্জাতীয় স্থানে বিভিন্ন বর্ণের ফুলের পাঁপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে আলপনা রচিত হতে দেখা যায়।

অবশ্য এভাবে উপকরণে বৈচিত্র্য বৃদ্ধির উল্লেখ না করে, এ থেকে এই সত্যে আসা চলে যে, মানুষ যতই সংস্কৃতিমনস্ক হয়ে উঠেছে ততই সে এই প্রাচীন চিত্রকলা পদ্ধতিকে নিজের পরিবেশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার করে চলেছে।

চার

আলপনা রচনার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক কুশলতার কথা দক্ষিণী আলপনার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য দক্ষ শিল্পী যে কোনরূপ যান্ত্রিক দক্ষতা বা সহায়তা ছাড়াই, শুধুমাত্র রং এর ব্রাশ দিয়েই নানা জাতীয় বিমূর্ত নকশা রচনা করতে পারেন—তাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমের মানভূমি অঞ্চলে আর এক ধরণের পদ্ধতি দেখা যায়। বাংলা দেশে বিশেষতঃ রাঢ়বঙ্গে যে ধরণের পদ্ধতি বা উপকরণ অর্থাৎ আঙ্গুল-নেকড়া-পিটুলী—এখানে কিন্তু তা ভিন্ন রূপ নিয়েছে। রাঢ়ী সংস্কৃতির এক অদ্ভুত মিশ্রণ দেখা যায় পশ্চিমের জেলাগুলিতে।

এরা আলপনায় শুধু সাদা রং ব্যবহার করেন না। পরিবর্তে নানা দেশীয় উপকরণ থেকে কালো, লাল, নীল প্রভৃতি রং সংগ্রহ করে তা আলপনায় সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করেন। আসলে এটা হয়েছে এ অঞ্চলের লোকদের মানসিক গঠনের জন্যই। একটু বেশী রংচং বা বর্ণাঢ্যতা ওদের সমাজের বৈশিষ্ট্য। তেমনি সাদা রং-এর প্রতি অধিক দুর্বলতা এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

এঁরা আলপনা দেবার সময়ে পিটুলী বা চালের গুঁড়িও ব্যবহার করেন—এটা উপকরণগত ব্যাপার। কিন্তু পদ্ধতি হিসাবে কখনও বা আঙ্গুল এবং কখন বা ঘাসের মুটি ব্যবহার করেন। শুকনো শক্ত ঘাস (এ দেশের চোর-কাঁটা জাতীয় শক্ত ঘাস) মুঠোয় ধরে রং-এ চুবিয়ে নকশা আঁকেন—অর্থাৎ যেন আদিম পদ্ধতির ব্রাশ বা বুরুশ। ফলে এইসব নকশায় ব্রাশের দাগ এমন সুন্দর ফুটে ওঠে যে, তা থেকেই আলাদা একটা সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। আঙ্গুলের

দ্বারা আঁকলে এমনটি করতে শিল্পীকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হত—তাতেও তিনি সফল হতেন না।

মেঝেয় আলপনা দেয়ার রীতিটি সর্বত্র বহুল প্রচলিত এবং তা মূলতঃ ব্রত-পূজা-উৎসব উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গৃহ-চিত্রণ বা অলংকরণের জন্যও আলপনার ব্যবহার যথেষ্ট দেখা যায়—বিশেষতঃ আদিবাসী সমাজে এটি খুবই জনপ্রিয় গৃহসজ্জা।

মেঝেয় আলপনার ক্ষেত্রে পিটুলী বা চক খড়ি—যাই ব্যবহার হোক না কেন, তা হয় মূলতঃ আঙুল বা ন্যেকড়া দিয়ে। দেয়াল চিত্রনের জন্য কিন্তু সেই পদ্ধতি চলে না। আলপনার জ্যামিতিক নকশা অর্থাৎ বৃত্ত বা ত্রিভুজ-কেন্দ্রিক নকশা কিংবা নানা বিরোধী বর্ণের সমাবেশ ছাড়াও, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঁকা হয় উপরোক্ত দেশীয় ব্রাশ দিয়ে। নচেৎ তরল রং গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে পড়তে পারে এবং মূল নকশা নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলেই সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা।

এ প্রসঙ্গে বসুধারার আলপনা দেওয়ার পদ্ধতিটা যে কত সরল, তা সহজেই অনুমান করতে পারা যায়। নিছক দেয়ালে হয় বলেই যে কোন অদক্ষ শিল্পী তা অনায়াসে অনুকরণ করতে পারে। কিন্তু তা যদি মেঝেতে করতে হত তবে দরকার হত অতিরিক্ত দক্ষতার। কেন না দেয়ালে তরল পিটুলী আলগা করে ধরলে তা প্রাকৃতিক নিয়মেই দেয়াল বেয়ে সরল রেখায় নীচে নেমে আসে—এতে কোন দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

আদিবাসী সমাজে আলপনার ক্ষেত্রে দেশীয় ব্রাশ ব্যবহারের ফলে হয়তো শিল্পীর কিছুটা পরিশ্রম লাঘব হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে নকশাটির সৌন্দর্যেও যে একটি অতিরিক্ত মাত্রা যুক্ত হয়—একথা স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য এর উত্তরটা বিতর্কিত।

পুরুলিয়া জেলার গ্রামাঞ্চলে এ'জাতীয় দেয়াল চিত্রণ বিশেষ সুলভ। খাটি দেশীয় রঙে, চড়া বর্ণ-বিন্যাসে কিছুটা জ্যামিতিক ভঙ্গীতে আঁকা এই সব নকশা আলোচ্য ধরণের নকশা থেকে কিছুটা ভিন্নধর্মী হলেও, নিঃসন্দেহে এগুলি লোকচিত্রকলারই নিদর্শন।

আবার বর্ধমান জেলার কাটোয়া অঞ্চলের গ্রামগুলিতে মাটির দেয়ালে

দরজা-জানালার চৌকাঠের ধারে সাদা রংয়ের আলপনাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আধুনিককালে কিন্তু শৌখিন শিল্পীর হাতে অবলুপ্তপ্রায় এই আলপনা শিল্প যেভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে, তার প্রধান পদ্ধতি কিন্তু ব্রাশকে কেন্দ্র করেই। রক্ষণশীল আলপনা আঁকিয়েরা হয়তো এ' কথা শুনে মুখ ঘুরিয়ে নেবেন। কিন্তু এ কালের শিল্পীরা যে পিটুলী গোলা নিয়ন্ত্রণে ততটা দক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি—এটাও এর দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হয়।

আসলে, একালে আলপনাকে একটি চারুকলারূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে, লোকশিল্পীর লোকচিত্রকলার ধরণে ফ্রি-হ্যাণ্ড-ড্রইং নয়, বরং অতি সূক্ষ্ম মাপ-জোকই আজ তার বৈশিষ্ট্য। আদিবাসী সমাজের দেশীয় ঘাসের ব্রাশের পরিবর্তে বিদেশী দামী ব্রাশ, দেশীয় পিটুলী গোলা বা নানাবিধ প্রাকৃতিক রং-এর পরিবর্তে চক খড়ি, জিংক অক্সাইড বা নামী কোম্পানীর পোষ্টার কালার আজ আলপনা রচনার উপকরণ।

চারুকলার একটি বিশেষ শাখারূপে চর্চিত হবার ফলে আজ বিভিন্ন ভাবে এর প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে—অবশ্যই এ সবই হচ্ছে শান্তিনিকেতনী ধারার নীতিতে। তাই বাটিক ছাপাই-এ আলপনার নকশা জনপ্রিয় থেকে জনপ্রিয়তর হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, গ্রন্থের প্রচ্ছদে দেখা যাচ্ছে আলপনার নকশা। এ ধরনের প্রচ্ছদ রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি চিত্রে স্বাক্ষর করতেন 'শ্রীআশু' নামে। যেহেতু আলপনা একটি ডেকরেটিভ আর্ট রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাই উক্ত শিল্পীর খ্যাতি হয়েছিল ঐ নামেই।

লোকসংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে উত্তরণের মাঝে এত যে চিন্তার, শ্রমের ও দক্ষতার বিবর্তন—এতগুলি দৃষ্টান্ত উপস্থিত না করলে তা সঠিকভাবে প্রকাশিত হত না। তাই যাঁরা লোকসংস্কৃতি বলতে একটা অদ্ভুত রোমান্টিক চিন্তায় মজ্জিত হয়ে গ্রাম-বাংলার স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা যে তাদের 'সংস্কৃতি' নির্মাণের জন্য লোকসংস্কৃতির উপরেই অনেকাংশে নির্ভরশীল, এই চিন্তা অন্তরে লালন করে এগিয়ে গেলে লোকসংস্কৃতি নামক শব্দটি ত্যাগ করে সব মিলিয়ে একটা শব্দই ব্যবহৃত হতে পারত—'সংস্কৃতি'—যা সবার জন্য। সেখানে গ্রাম-শহরের ভেদ নেই। যেখানে মানুষ এবং তার চিন্তার নান্দনিক প্রকাশই হল জীবন চর্যার চরম ও শেষ-কথা।

সেঁজুতি ব্রতের আলপনা

এক

যে কোন ব্রত পালনের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সকলেরই নজরে আসে— প্রথমতঃ এর কথা অংশ, যাকে লোকসাহিত্যের ভাষায় বলা যায় ব্রতকথা এবং দ্বিতীয়তঃ এর আলপনা অংশ, যাকে লোকসংস্কৃতির ভাষায় বলা যায় লোকশিল্প বা সূক্ষ্ম অর্থে লোকচিত্রকলা।

ব্রতের আলপনা যে ব্রত উদ্‌যাপনের অন্যতম মাধ্যম, ব্রতকথার চেয়ে যে তার গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়—এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। ব্রতীর মনস্কামনা পূরণের জন্য ব্রতের অন্যান্য উপকরণ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তার প্রধান মাধ্যম হল এই আলপনা। তাই—সকল ব্রতেই ব্রতীর আত্মশুদ্ধিকরণ, উপকরণ সংগ্রহ ইত্যাদি সাংগঠনিক কাজ হয়ে গেলেই আলপনা আঁকাই ব্রতীর প্রথম কাজ।[১]

উপকরণের বাহুল্য বা সারল্য ব্রতকথার আলপনাগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যে ব্রতে ব্রতীর মনস্কামনা একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ, তার উপকরণ ও নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু যে ব্রতীর মনস্কামনা প্রচুর বা অনির্দ্দিষ্ট তার আলপনাও তত জটিল ও ভারাক্রান্ত।

ইচ্ছাপূরণের অন্যতম মাধ্যম বলে, আলপনায় ব্রতীর অনেক ইচ্ছা সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশ করা হয়। মানুষের মনের গোপন ইচ্ছার প্রতীকী প্রকাশ হল এই সব নকশাগুলি।

সেদিক থেকে বিচার করলে সেঁজুতি ব্রতের নকশা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই আলপনা এখন যে ভাবেই আঁকা হোক না কেন বা এই ব্রত এখন যে ভাবেই উদ্‌যাপিত হোক না কেন—এই ব্রতের কিছু কিছু আদর্শায়িত চিত্র এখনও ব্রত কথার বইয়ে পাওয়া যায়।

অবশ্য লোকসংস্কৃতির আলোচনার ক্ষেত্রে আদর্শায়িত কথাটি নিতান্তই বিতর্কের সূচনা করে। তবু, অনুকরণেরও যদি একটি আদর্শ না থাকে, তবে

অনুকরণটি ব্যর্থ হয়ে যায় কিংবা 'সাত নকলে আসলও খাস্তা' হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

সেঁজুতি ব্রতের নকশাটির যথাযথ রূপ প্রকৃত পক্ষে কোন গ্রন্থকারই সঠিক ভাবে তুলে ধরেন নি। অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' (১৯৪৩) গ্রন্থে এই আলপনার চিত্র সংখ্যা হল চল্লিশ। অবশ্য তাঁর গ্রন্থের চিত্র থেকে সে কথার প্রমাণ হয় না। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ইংরাজিতে রচিত 'Alpona' (১৯৪৮) গ্রন্থে সেঁজুতি ব্রত সহ অন্যান্য বহু আলপনার নিদর্শন আছে। কিন্তু তিনি এর উপকরণের সঠিক সংখ্যাটি বলেন নি। তবে তাঁর গ্রন্থে আলপনার চিত্র আছে ১৩টি এবং এটি প্রথম গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

অপরপক্ষে, দুর্গা মুখোপাধ্যায় যেখানে তাঁর গ্রন্থে 'সেঁজুতি' ব্রতের আলোচনায় ১৫টি চিত্র উল্লেখ করেছেন ও একটি চিত্রও সংযুক্ত করেছেন, সেখানে স্বামী নির্মলানন্দ তাঁর 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' গ্রন্থে এর সংখ্যা বলছেন 'অন্ততঃ বাহান্ন রকম'— কিন্তু চিত্রে তা প্রকাশ করেন নি।[২]

উপরোক্ত গ্রন্থকারত্রয় (অবনীন্দ্র ও তপনমোহন মূলতঃ একই চিত্র ব্যবহার করেছেন) কে, কোথা থেকে এবং কি করে এই আলপনা সংগ্রহ করেছেন— সে বিষয় কোন মন্তব্য করেন নি। তবু অবনীন্দ্র ও দুর্গা প্রণীত গ্রন্থে এর সংখ্যা যথাক্রমে ১৩ ও ১৫ হওয়ায়, এ বিষয়ে খুব বির্তক ওঠে না। তখনই প্রশ্ন জাগে, তাহলে এই আলপনার প্রকৃত আদর্শায়িত রূপ কোনটি কি?[৩]

তুলনামূলক ভাবে দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থে এর যে চিত্র আছে, তা অনেক বিশদ। তিনি তার সংগৃহীত আলপনায় মোট ৪৮টি চিত্র সংযোজন করতে পেরেছেন ও যথাস্থানে তার বিবরণ দিয়েছেন। চিত্র সংযোগ করার দরুণ তাঁর গ্রন্থটিকে স্বামী নির্মলানন্দের গ্রন্থ অপেক্ষাও (সেখানে শুধু সংখ্যার উল্লেখ আছে, কোন চিত্র নেই) সমৃদ্ধ বলা যেতে পারে। সেই কারণেই দক্ষিণারঞ্জনের সংগৃহীত চিত্র ও চিত্র-সংখ্যাকে প্রামাণিক বলতে বাধা নেই। আলপনা যদি ব্রতীর মনের সুপ্ত ইচ্ছার প্রতীকী রূপ হয়, তবে দক্ষিণারঞ্জনের ৪৮টি উপকরণ-যুক্ত-আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই ব্রতীর অবচেতন মনের সুপ্ত ইচ্ছাকে মাত্রাতিরিক্ত রহস্য-ময়তায় ইঙ্গিত-পূর্ণ করে তোলে।[৪]

প্রকৃত পক্ষে আলপনার নকশার এই উপকরণ অসাম্যের মূল কারণ বোধহয় অন্যত্র নিহিত। কেন না এই ব্রতের নকশা আঁকার নিয়ম অন্যান্য ব্রতের

নকশা থেকে কিছুটা ভিন্নধর্মী। এই ব্রতে অঘ্রাণ মাসের প্রতি সন্ধ্যায় একটি নতুন আলপনা আঁকা হবে—এমন নির্দেশ আছে। মাস শেষে অর্থাৎ অঘ্রাণ সংক্রান্তির সন্ধ্যাবেলায় সবগুলি নকশা একসঙ্গে আঁকা হয়। সে সন্ধ্যায় বাড়ীর উঠানটি একেবারে আলপনার নকশায় পূর্ণ হয়ে যায়।[৫]

সুতরাং উপকরণ অসাম্যের মূল তত্ত্বটি এও হতে পারে যে, যিনি যখন আলপনার নমুনা সংগ্রহ করেছেন, তখন হয়তো ব্রতীর ব্রত-মাস সম্পূর্ণ হয়নি, তাই নকশাগুলি পূর্ণাঙ্গ নয়। অপর পক্ষে দক্ষিণারঞ্জন পূর্ণ মাস অপেক্ষা করার পর আলপনার পূর্ণাঙ্গ রূপটি সংগ্রহ করেছেন।

আলপনার নকশায় এতগুলি উপকরণ থাকা সত্যই একটি বিচিত্র ব্যাপার। দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থে ভাদুলী ব্রতের আলপনায় ২২টি এবং তারা ব্রতের নকশায় ১২টি চিত্র স্থান পেয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থকারেরা বা সংগ্রাহকেরা এত অধিক সংখ্যক চিত্র সংগ্রহ করতে পারেননি—তাই আলোচনার সুবিধার জন্য দক্ষিণা-রঞ্জনের সংগৃহীত চিত্রটিকে 'আদর্শায়িত' চিত্র ভেবে নিলে অনেক দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয়।

প্রচলিত অন্যান্য ব্রতের আলপনার তুলনায় এই আলপনায় এত বেশী উপকরণ—তার একটা সম্ভাব্য কারণ হল যে, এতে রোজ একটি করে উপকরণ আঁকতে হয়। এই প্রথা অন্যান্য ব্রতের বেলায় নেই। তাই এই আলপনাটি এত জটিল ও উপকরণ জর্জরিত। নচেৎ অধিকাংশ ব্রতই প্রতি বছর এক মাস করে, সেই সেই মাসে পর পর চার বৎসর করার নিয়ম। কিন্তু আলপনার ক্ষেত্রে অতটা কড়াকড়ি না থাকায় সেই সব ব্রতের আলপনাও বেশ ক্ষুদ্রাকার ও সরল।

এই আলপনার গঠনটিও বড় উদ্ভুত। যদি দক্ষিণারঞ্জন সংগৃহীত রূপটিই আদর্শ বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে যে, এটি যেন নকশা নয়—প্ল্যান। প্ল্যান অর্থে বাড়ীর প্ল্যান, জমির প্ল্যান, রাস্তা-ঘাটের প্ল্যান ইত্যাদি। প্ল্যানে যেমন সব কিছুই থাকে নিঁখুত মাপ-জোকের আকারে, এই ব্রতের আলপনাটিও যেন তেমনতর। এর মধ্যে শিল্পীর কল্পনা শক্তির পরিচয় অবশ্যই আছে, কিন্তু তাও খুব মাপ-জোক করা। অতিরিক্ত কোন উচ্ছ্বাস চোখে পড়ে না। তাই অন্যান্য ব্রতের আলপনা যেমন নকশা জাতীয়, এটিকে তেমন বলা যায় না।

মালপনা জাতীয় ড্রইং-এর ক্ষেত্রে 'Symmetry' শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শান্তিনিকেতনী ধারায় আজ কাল তা একটি প্রয়োজনীয় বিধি। পৃথিবী ব্রত, হরির চরণ ব্রত প্রভৃতির নকশা যেমন অলঙ্করণধর্মী, এ ব্রতের নকশা তেমন নয়। পূর্বোল্লিখিতগুলির সৌন্দর্য বিকাশের ক্ষেত্রে Symmetry একটি প্রধান গুণ।

আবার তারা ব্রতের সূর্য ও মানুষ, ভাদুলী ব্রতের নৌকা, রথোৎসবের রথ ইত্যাদি শিল্পনীতির নিয়মে পূর্বোক্তগুলির মত Symmtrical নয় সত্য, কিন্তু এগুলির মধ্যে এমন এক ধরনের প্রতীকী ব্যঞ্জনা আছে—যার দ্বারা নকশাটি রথ না হয়েও রথের রূপকে প্রকাশ করতে পেরেছে এবং একই ভাবে সূর্য, মানুষ ও নৌকাকেও।

আলোচ্য দুটি শ্রেণী থেকেই সেঁজুতি ব্রতের প্রকরণ বেশ ভিন্ন। সেঁজুতির আলপনাকে কিছু পরিমাণে লক্ষ্মীর আলপনা, মনসার আলপনা, ইন্দ্রপূজার (ভাজো) আলপনা, তারা ব্রত বা ভু-মণ্ডল ব্রতের আলপনার সঙ্গে তুলনীয় বলা যেতে পারে। কেন না এসব ক্ষেত্রে আলপনাগুলি কোন একটি আলপনা নয়, একগুচ্ছ আলপনা। পূর্বোক্তনকশা গুলির থেকে এদের পৃথক নামকরণ করতে হলে, বলা উচিত যথাক্রমে একক আলপনা ও যৌগিক আলপনা।

সেঁজুতি ব্রতের আলপনার ক্ষেত্রে যৌগিক কথাটি যে অর্থে প্রযুক্ত, তার একটা তাৎপর্য আছে —কারণ তা একদিনে যৌগিক হয়ে ওঠেনি। প্রতিদিন আলপনার একটি একটি একক সঞ্চিত হয়ে, অবশেষে তা ব্রত সমাপনের দিন যৌগিক রূপ ধারণ করেছে।

তাই, গঠনে যৌগিক প্রকৃতির হলেও লক্ষ্মী, মনসা, ইন্দ্র, তারা প্রভৃতি ব্রতের আলপনার থেকে একমাত্র উপরোক্ত কারণেই সেঁজুতির আলপনা এক পৃথক শ্রেণীতে বিরাজ করছে।

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে শিল্প-শাস্ত্রের নীতিতে একক আলপনা বা যৌগিক আলপনা নামক শব্দগুলি আছে কিনা—এ নিয়ে সংশয় থাকলেও যেহেতু আলপনা শিল্প মূলতঃ লৌকিক রীতি-নীতি নির্ভর, তাই ঐ সব শব্দের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যাও লৌকিক নিয়মে করাই বাঞ্ছনীয়।

এটি যে সত্যই একটি প্ল্যানের মত, তার প্রমাণ মিলবে শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধ থেকে। তিনি এই ব্রতকথা আলোচনার সময়ে

ব্রতের প্রচলিত নকশাটিকে প্রায় ঢেলে সাজিয়ে যে রূপ দিয়েছিলেন, তা সঠিক অর্থেই একটি প্ল্যান—অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রের সমন্বয়ে তৈরী। এ গুলির মধ্যে ব্রতের অন্যান্য আলপনার সেই ইঙ্গিতময়তা নেই। নেই ভাবের প্রতীকী বা ব্যঞ্জনাধর্মী প্রকাশ। তাঁর দেয়া নকশাটিতে গ্রামীন সরলতা ছিল না। ছিল একটি শিক্ষিত নাগরিক মনের প্রকাশ। তাঁর আলপনায় সবই ছিল, অথচ কিছুই যেন ছিল না।[৬]

আশ্চর্যের কথা এই যে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ ও চর্চার একান্ত একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক হয়েও দক্ষিণারঞ্জন অগ্রজের এই নকশাটিকে পরম শ্রদ্ধায় তাঁর নিজের 'ঠানদিদির থলে' বা 'বাংলার ব্রতকথা' গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন এবং এই নকশাটিও যে সেঁজুতি ব্রত পালনের জন্য ব্রতীরা ব্যবহার করতে পারেন, তার অনুকূলে মত দিয়েছেন। দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থে তাঁর সংগৃহীত এবং অক্ষয় চন্দ্রের—পুনরঙ্কিত চিত্রগুলি পাশাপাশি থাকায় গ্রামীণ ও নাগরিক শিল্প চেতনার একটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।[৭]

পৃথিবী, হরির চরণ, মাঘমণ্ডল প্রভৃতি ব্রতের নকশাকে যদি বলতে হয় decorative বা অলংকরণধর্মী, তারা ব্রত, ভাদুলী ব্রত বা অন্যান্য ব্রতের নকশাকে বলা উচিত Concrete বা মূর্ত ধর্মী। অপর পক্ষে, লক্ষ্মী, মনসা, ইন্দ্র প্রভৃতি ব্রতের আলপনাকে যদি Compound বা যৌগিক আলপনা বলতে হয়, তবে সেঁজুতি ব্রতের আলপনা যৌগিক শ্রেণীভুক্ত হলেও—একটি বিশেষ নাম তার দেওয়া উচিত। এই আলোচনার পটভূমিতে একে যদি বা Diagramatic বা রেখাধর্মী বলা হয়—তবে বোধহয় কিছুটা সঙ্গত হয়।

তবে আলপনার অংকন রীতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উৎসবমুখী অর্থাৎ Ceremonial ও অলংকরণমুখী অর্থাৎ Decorative—শব্দ দুটি বহুকাল ধরেই প্রচলিত। প্রথমটির ক্ষেত্রে ব্রতীকে অংকনের নিয়ম-শৃংখলা যতটা কঠোর ভাবে মেনে চলতে হয়, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ততটা নয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কল্পনা বা আবেগের একেবারেই স্থান নেই। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তা কিছুটা অনুমোদন যোগ্য।[৮]

সেদিক থেকে বিচার করলেও বোধহয় সেঁজুতি ব্রতের আলপনা ঠিক এর মাঝামাঝি পর্যায়ে পড়বে। এটি উৎসবমুখী ঠিকই, তবে অত কঠোর নিয়ম

মেনে চলে না। তাহলে উপকরণের কম বেশী হয় কেন? সেই সঙ্গে এটি কিছুটা অলংকার ধর্মীও বটে।

তিন

আদি গুহা-মানব কেন যে বন্য পশুর চিত্র অংকন করে তাতে চিত্রের মাধ্যমেই তীর বিদ্ধ করত—এ তথ্য এখন আর নৃতাত্ত্বিকের কাছে বিস্ময়ের বস্তু নয়। মনের কোন গুপ্ত বাসনা এর দ্বারা সিদ্ধ হত—সে সত্য আজ আর অজানা নেই।

লোকবিশ্বাসে এই পদ্ধতিটি অতি প্রাচীন কালের—সম্ভবতঃ 'ধর্ম' নামক চিন্তাটি সঠিক ভাবে দানা বাঁধবার আগেও এ ধরনের সংস্কার প্রচলিত ছিল।

তাই শুধু গুহাগাত্রে নয়, তার পরবর্তী যুগে পট চিত্র অংকনের সময়েও মনস্কামনা পুরণের এই বিচিত্র মাধ্যম ব্যবহৃত হত। নানা শ্রেণীর পটের মধ্যে তাই চক্ষুদান পট বা যাদুপট এক বিশেষ শ্রেণীর। এই শ্রেণীর পটে মানব মানবীর চোখে দৃষ্টি থাকে না। গৃহস্থ বাড়িতে প্রচারের সময় বলা হয় উপযুক্ত দক্ষিণা দিলে, তবে পটিদার তার চোখ ফুটিয়ে দেবে। তখন গৃহস্থের আত্মীয়-স্বজন প্রিয়জনের আত্মা দৃষ্টিমান হয়ে স্বর্গে যাবে, নচেৎ তাঁর আত্মা পৃথিবীতেই ঘুরবে—এই পাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পটিদারকে টাকা দিয়ে ছবিতে চোখ ফুটিয়ে নেয়। যাদুপট সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যেক বিশেষজ্ঞই এই বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[২]

এক দিকে ব্যক্তির অক্ষমতা, অপর দিকে চূড়ান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা—এই দুইয়ের মধ্যে সঙ্গতি সাধনের জন্য আদি মানবের তথা পটিদার সম্প্রদায়ের এই প্রচেষ্টা। এই সঙ্গতি সাধনের মাধ্যমটি প্রকাশ্যে চিত্রকলা হলেও পরোক্ষে তা হল চিত্রকলার আবরণে যাদুচর্চা—যাকে নৃতাত্ত্বিকরা বলেছেন কৃষ্ণযাদু বা Black Art.

প্রকৃত পক্ষে, উদার ভাবে বলতে গেলে সকল ব্রত পালনই এক ধরণের কৃষ্ণযাদুর চর্চা ছাড়া আর কিছু নয়। ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে যা কিছু করা হয়—তা সবই বাস্তব পৃথিবীর অনুকৃতিকে সামনে রেখে বা আপনার দ্বারা সেই অনুকৃতিকেই উপস্থিত করা হয়। এ দেশে প্রচলিত সকল প্রকার ব্রতই

তাই মূলতঃ জীবন ধারণের তথা জীবন সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত ঘটনার প্রতীকী প্রকাশ মাত্র। এগুলিকে স্থূল ভাবে কৃষি সংক্রান্ত, প্রজনন শক্তির ও কৃষি-সংক্রান্ত গুহ্য যাদু-শক্তির পূজা বলা যেতে পারে। যেহেতু গ্রাম্য জীবনের মূল কেন্দ্র কৃষি-কাজ, তাই ব্রত পালনের উদ্দেশ্য সাধনে কৃষি কাজই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে এবং তার পরে গুরুত্ব পেয়েছে পারিবারিক মঙ্গল ও অন্যান্য ব্যক্তিগত কারণ।[১০]

এগুলির দ্বারা সত্যই কোন ফল লাভ হয় কিনা—কোনদিন তার কোন বিজ্ঞান-সম্মত সমীক্ষা হয়নি বা তা হওয়া সম্ভবও নয়। যে যুগে যে মানসিকতায় এর জন্ম তা প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক কালের না হলেও, যে মন এর পেছনে ক্রিয়াশীল, তা প্রায় আদিম অবৈজ্ঞানিক মনেরই সমতুল্য। তন্ত্র সাধনায় মারণ-উচাটন, বশীকরণ-এর যে কাজ, এই সব ব্রত পালনের উদ্দেশ্য মূলতঃ তাই। প্রথমটির ক্ষেত্রে যা নেতিবাচক, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তা কিছুটা ইতিবাচক বলা যেতে পারে। তবে, দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবধানে তার রূপ কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র।

যেহেতু এই ব্রতের বিষয়বস্তু পারিবারিক মঙ্গল কামনা—তাই ব্রতীর মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। কেন না যে ব্রত কৃষিতে প্রজনন শক্তির জন্য বা অন্য কোন গুহ্য শক্তির অধিকারী হবার জন্য পালন করা হয—তার একটি নির্দিষ্ট সীমা রেখা আছে। কিন্তু পরিবারের মঙ্গল কামনায় যে ব্রত, সেই ব্রতীর মনে ইচ্ছার শেষ নেই।

সেঁজুতি ব্রতের আলপনাকে যদি যৌগিক চিত্রের নকশাই বলা হয়, তবে এতে এক একটি উপকরণ এক একটি ইচ্ছার প্রতীক মাত্র। সেই ইচ্ছার শেষ নেই বলে আলপনা অংকনে উপকরণের শেষ নেই। তাই একে একে উপ--করণের সংখ্যা বেড়েই চলে। কোন মানুষের ব্যক্তিগত সব ইচ্ছার একটা শেষ থাকে—কিন্তু পরিবারের বা গোষ্ঠির মঙ্গল কামনায় কোন নিবৃত্তি নেই। যেহেতু কোনদিনও তা বাস্তবায়িত হবার নয়। তাই গোপন ইচ্ছা এই ভাবেই বেড়ে চলে ও আলপনা অংকনেও তাই প্রতীক বেড়েই চলে।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, এত অধিক যাদুশক্তির ব্যবহার কোন ব্রতের নকশায় দেখা যায় না।

এইসব চিত্রের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা এত বেশী বলে বিশ্বাস করা হয় যে

আলপনার 'দোলা' যেন বাস্তবের 'দোলা' হয়ে দেখা দেয় এবং সে ক্ষেত্রে ব্রতীর মনের সুপ্ত ইচ্ছা হল : 'বাপের বাড়ীর দোলাখানি শ্বশুর বাড়ী যায়। আসতে যেতে দুইজনে ঘৃত মধু খায়।[১১]

অনুরূপভাবে, গর্ভিণী নারীর যেন কোন পুত্র সন্তান হয়—এই কামনায় তখন বলা হয় : 'মাকড়সা মাকড়সা চিত্রের কৌটা। মা যেন বিয়োয় চাঁদ পানা বেটা॥' এখানে যে চিত্রটি দ্বারা এই কামনার প্রকাশ হচ্ছে, তা হল মাকড়সা।

এই যাদুক্রিয়ার চরম প্রকাশ হয়েছে নীচের মন্ত্র বা ছড়াতে : 'আমি পূজা করি পিটুলির বালা। আমার হয় যেন সোনার বালা॥ আমি পূজা করি পিটুলির রান্না ঘর। আমার হয় যেন কোঠার রান্না ঘর॥ আমি পূজা করি পিটুলির গোহাল। আমার হয় যেন কোঠার গোহাল॥ আমি পূজা করি পিটুলির ঘরকন্না। আমার হয় যেন অট্টালিকার ঘরকন্না॥'

এই মন্ত্রে যাদুক্রিয়ার ব্যাপারটা এতই স্বপ্রকাশ যে তার জন্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয় না। শুধু এই ব্রতের বলে নয়, ব্রতানুষ্ঠান যে মূলতঃ এক উন্নত ও সমাজ-স্বীকৃত কৃষ্ণযাদুর চর্চা—তা বোঝা যায়।

অনুরূপ ভাবে, সতীন দমনের জন্য যে সব চিত্র ও মন্ত্র অংকিত ও উচ্চারিত হয়, তাও ভীষণ রকম যাদুক্রিয়ায় আচ্ছন্ন। আলোচ্য ব্রতের জন্য ব্রতী আঁকেন ঢেঁটি কর্কটি, আয়না, উদ্‌বিড়ালী, খ্যাংরা, বেড়ী, খোরা, হাতা, পাখী প্রভৃতি। আপাত দৃষ্টিতে এগুলি খুব সরল। কিন্তু এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছড়া বা মন্ত্র উচ্চারণ না করলে এর মধ্যস্থ যাদুশক্তিটি প্রকাশ পাবে না। তখন আয়না, বেড়ী, খ্যাংরা বা হাতা ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে হয়ে উঠবে সতীন দমনের মোক্ষম অস্ত্র—অন্ততঃ ব্রতীর মনে সেই বিশ্বাস।

শুধু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-কন্যা নয়, রাজ-রাজড়ার মেয়েও যে সেঁজুতির আলপনা এঁকে মনস্কামনা সিদ্ধির চেষ্টা করে, তার বিবরণ আছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে। নায়িকা তিলোত্তমা যখন 'সেঁজুতির শিব' আঁকেন, তখনই তাঁর মনের গোপন চিন্তাটি আমাদের কাছে স্বপ্রকাশ হয়। জগৎ-সিংহের প্রতি প্রণয়াবিষ্টা তিলোত্তমার পূর্বরাগের চিত্রটি সেঁজুতি ব্রতের শিব আঁকার মধ্য দিয়ে সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[১১ক]

চার

প্রকৃত জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অন্যতম রূপে যদি ইন্দ্রজাল বা ঐন্দ্রজালিকতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবে এর সঙ্গেই যে লোকসংস্কৃতির সর্বাধিক সম্বন্ধ—তা নৃতাত্ত্বিকগণ স্বীকার করে নেন। যেখানেই সমস্যা এবং সমাধানের পথ নেই, সেখানেই অবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ এবং ইন্দ্রজালের আধিপত্য।

ব্রতার্চনার বৃহৎ রূপই দেখা যাবে গ্রামীন সমাজের অন্যান্য নানা ক্ষেত্রেও। তাই সেঁজুতি ব্রতের অংকন-শৈলী ও তার যাদুপ্রভাবের পটভূমিতে লোক-সাহিত্যের অন্যতম শাখা 'কথা'-র প্রসঙ্গ আসতে পারে। কেননা, ব্রতের ছড়ার বা অংকনের ঐন্দ্রজালিকতা খুব সহজেই তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

যেখানে সোনার কাঠির স্পর্শে ব্যক্তি জেগে ওঠে ও রূপার কাঠির স্পর্শে ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়ে, যেখানে তরবারিতে মরিচা ধরলে রাজপুত্রের প্রাণ সংশয় উপস্থিত হয়, যেখানে মন্ত্রঃপূত জল ছিটালে পাথরও জীবন্ত হয়ে ওঠে—সেখানে যুক্তি ও বাস্তব অপেক্ষা কল্পনা এবং ইন্দ্রজালের প্রাধান্যই যে বেশী এবং তার মূলে যে অক্ষম মনের বিজয়ী হবার আকাঙ্ক্ষা কাজ করছে—একথা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়াই ভাল।

লক্ষণীয় যে এই সব সমস্যাগুলিও কিন্তু মূলতঃ জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত—জীবন অর্থে প্রাণ। ব্রতের আলপনার ক্ষেত্রেও ছিল সেই জীবন এবং প্রাণই। তাই উভয় ক্ষেত্রে এবং অত্যন্ত সচেতনভাবে একই স্বার্থে ইন্দ্রজালের প্রয়োগ করা হয়েছে।

তফাৎ হল এই যে, রূপকথায় যা করা হল কায়িক আচরণের মাধ্যমে, আলপনায় তা করা হল শিল্প কর্মের দ্বারা—অন্ততঃ তাই বিশ্বাস করা হয়। সম্ভবতঃ এই ঐন্দ্রজালিকতার জন্যই সেঁজুতি ব্রতের আলপনা এত জটিল।

শুধু রাজা রাণীর রূপকথা নয়—,মন্দ আত্মা, অপদেবতার জন্যও ইন্দ্রজালের ব্যবহার ও চর্চা লোকজীবনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। ডাইনী ভর করা ও ডাইনী তাড়ানো তার মধ্যে অন্যতম। আয়নার সঙ্গে ডাইনীর এক অশুভ এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। সম্ভবতঃ এই জন্যই আয়নাকে ইন্দ্রজালের প্রতীক

রূপে আঁকা ও ব্যবহার করা হয়। মায়া-দর্পণে আসন্ন ঘটনা প্রতিফলিত হওয়া—লোক সমাজের এক দৃঢ় সংস্কার। তা ছাড়া বিভিন্ন রূপকথায় তো দর্পণের ভীষণ জনপ্রিয়তা। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অত্যন্ত সচেতনভাবে তার কাব্যে-নাট্যে আয়না ব্যবহার করেছেন শিল্পসম্মতভাবে। এ প্রসঙ্গে তার 'বিম্ববতী' নামক রূপকথা কবিতা এবং 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের' কথা অনেকেরই মনে আসবে।

আধুনিক কালে লোককথার বিজ্ঞানভিত্তিক পঠন-পাঠন শুরু হওয়ার পর যে মাপকাঠি এর জন্য ব্যবহার হয়, তার নাম হল মোটিফ বিশ্লেষণ। অধ্যাপক ষ্টীথ টমসন এর প্রবক্তা। তিনি রূপকথার যাবতীয় মোটিফকে প্রধান ২০টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে সি, ডি, এফ, এল, এন, ইত্যাদি মোটামুটি ইন্দ্রজাল, অলৌকিক ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। এগুলির মধ্যে টাবু বা বিধিনিষেধ, ম্যাজিক, রূপান্তর, বিবিধ অলৌকিক বিষয়, ভাগ্যের খেলা, ভাগ্য পরিবর্তন ইত্যাদি সবই আছে। এছাড়া অন্যান্য মোটিফেও কিছু না কিছু ইন্দ্রজাল বা যাদুক্রিয়ার প্রভাব রয়েই গেছে।[১২]

টমসন সাহেব রূপকথার যাবতীয় মোটিফকে যে ভাবেই শ্রেণীবদ্ধ করুন না কেন, দ্রুত-পঠনের দ্বারা এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ইন্দ্রজাল ও অলৌকিক ঘটনা রূপকথার গঠনের প্রধান সূত্র। এই বিষয়টি বাদ দিলে রূপকথার গঠন একান্ত অসম্ভব হয়ে পড়বে। সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তবকে স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে অবাস্তবের রাজ্যে গমনের সাহিত্যসম্মত ও মনোবিজ্ঞানসম্মত একমাত্র সিঁড়ি হল তাই যাদুক্রিয়া।

তাঁর বিশদ শ্রেণীবিন্যাস নীতি অনুযায়ী বঙ্গীয় লোককথাসমূহের টাইপ বিভাজন করে মোট ২৩০০টি বিশদ টাইপ অনুসন্ধান করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ৩০০—৭৪৯ ম্যাজিক ও ইন্দ্রজাল পর্যায়ের। এইসব টাইপের আরো সূক্ষ্ম শ্রেণীবিন্যাস হল: ৩০০—৩৯৯ ম্যাজিক ও ইন্দ্রজাল, ৪০০—৪৫৯ অলৌকিক, বশীকরণ ইত্যাদি, ৪৬০—৪৯০ অসাধ্য সাধন, ৫০০—৫৫৯ অলৌকিক সাহায্যকারী, ৫৬০—৬৪৯ ম্যাজিক বস্তু, ৬৫০—৭৪৯ অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান।[১৩]

সুতরাং লোক কাহিনীতে যাদুক্রিয়ার কী প্রচণ্ড প্রভাব তা এই শ্রেণী বিন্যাস থেকেই অনুমান করা যায়। মৌখিক বিনোদন মূলক কাহিনী যদি

যাদুক্রিয়া ছাড়া গড়ে উঠতে না পারে, তবে লৌকিক আচরণে যে তার প্রভাব বিশেষ ভাবে থাকবেই—এ তো স্বতঃসিদ্ধ। বরঞ্চ বলা যায় লোকসাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতিতে যাদুর এই আধিপত্য—এতো প্রায় টাকার এপিঠ-ওপিঠের মতই সত্য—অর্থাৎ পরস্পর অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

ব্রতের আলপনায় ইচ্ছাপূরণ, কৃষ্ণ যাদু ইত্যাদি বিষয়ে যে সব মন্তব্য করা হয়েছে, সেই সঙ্গে সেঁজুতি শব্দের অভিধানিক অর্থ 'সন্ধ্যাবেলার প্রদীপকে' ঈষৎ সম্প্রসারিত রূপে প্রয়োগ করলে, ব্রত পালন যে মূলতঃ উন্নত ধরণের যাদু-ক্রিয়ার চর্চা—সে প্রতিপাদ্যে পৌছানো আরো সহজ হবে।

আদিম কাল থেকেই পৃথিবীর সমগ্র জন সমাজে অলৌকিক উপায়ে কার্য্য-সিদ্ধির জন্য প্রধানত: সন্ধ্যাকালকে প্রকৃষ্ট সময় বলে মনে করা হয়। মারণ, উচাটন, বশীকরণ বা তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি যাবতীয় আধিভৌতিক ক্রিয়া-কলাপ পালনের জন্য সন্ধ্যাবেলাই যে উৎকৃষ্ট সময়—তা বহুস্থানে উল্লিখিত ও সেইমত পালিত হয়েছে।[১৪]

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার একটি আচরণ এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামীকে বশ করবার জন্য সে যে ওষুধ সন্ধান করতে অরণ্যে গমন করেছে—তা' সমগ্র কাহিনীকে এক বিশেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, যে সময়ে কপালকুণ্ডলা অরণ্যে গমন করেছিল, তা হল সন্ধ্যার পর।

গোধূলির পরবর্তী কাল এবং রাত্রির আগমনের পূর্ববর্তী সময়—এই মধ্য সময়টি যে সত্যই রহস্যময়, তার আরো একটি নিদর্শন আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে চর্য্যাপদের ভাষার কথা মনে করা যেতে পারে। ভাষা-বিজ্ঞানীরা সেই অস্পষ্ট, রহস্যময়, হেঁয়ালি-ভরা ভাষ'কে নাম দিয়ে ছিলেন সন্ধ্যাভাষা। সে ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ সন্ধ্যাকালের ভাষা নয়, সন্ধ্যার রহস্যময়তায় ঘেরা ভাষা। চর্য্যাপদের ভাষার ক্ষেত্রে এই নাম যে নিতান্তই সার্থক, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এত অধিক সংখ্যক ইচ্ছাপূরণ যার মাধ্যমে করা হবে, তার পালনীয় সময় তার জন্যই কি সন্ধ্যাবেলা,—প্রকাশ্য দিবালোকে নয়? নচেৎ প্রচলিত ব্রত-গুলি পালনের জন্য তো সাধারণতঃ প্রত্যূষকাল, দ্বিপ্রহর ইত্যাদি সময়ই নির্দিষ্ট কিন্তু সেঁজুতি ব্রতের জন্য সন্ধ্যাকাল নির্দিষ্ট কেন? এই ব্রতের ব্রতীর আকাঙ্ক্ষা

বা গোপন ইচ্ছা যদি সীমিত হত—তবে হয়তো তা সন্ধ্যা ছাড়া দিবসের অন্য কোন সময়েও হতে পারত।

পাঁচ

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সেঁজুতি ব্রতের নকশার অন্তর্ভুক্ত উপকরণগুলি—অর্থাৎ যাদের সমন্বয়ে এই বিচিত্র যৌগিক নকশাটি নির্মিত বা রচিত হয়েছে, তাদের কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

সেঁজুতি ব্রতের একটি বিশদ আলপনায় কমপক্ষে ৪৮টি উপকরণ দেখা যায়। ইতিপূর্বে দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থ ছাড়া আর যে দুটি গ্রন্থে এই আলপনার সংক্ষিপ্ত রূপ সংকলিত হয়েছে, সেগুলির কোনটির সঙ্গেই কোনটির মিল নেই। সংশ্লিষ্ট উপকরণগুলি নকশায় স্থাপনের ব্যাপারে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। ব্রতীর ইচ্ছানুযায়ী সেগুলি আলপনার যে কোন স্থানে থাকলেই হল। তাই একই সংখ্যক্ উপকরণ থাকলেও, এগুলির উপস্থাপন প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়। লক্ষ্মীপূজা, ইন্দ্রপূজা ও তারা ব্রতের আলপনার ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য।

দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠান্‌দিদির থলে'-র বিবরণ অনুযায়ী সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় সাধারণতঃ যে সব বস্তুর প্রতীকী চিত্র আঁকা হয়, আলোচনার সুবিধার জন্য সেগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়—(১) গৃহ-বসতি মূলক, (২) বৃক্ষ-লতা জাতীয় উদ্ভিদ জগৎ, (৩) পশু-পাখী জাতীয় প্রাণী জগৎ, (৪) গৃহ-সামগ্রী উপকরণবাচক, (৫) দেব-মানব-মূর্তি বিষয়ক, (৬) প্রকৃতিমূলক।

এই শ্রেণীবিভাগ নিতান্তই স্থূল বলে মনে হতে পারে, তবে অবৈজ্ঞানিক নয়। উৎসাহী সমীক্ষক এগুলির সামাজিক তাৎপর্য অনুযায়ী আরও বিশদভাবে শ্রেণীকরণ করতে পারেন।

প্রথম পর্যায়ের মধ্যে যেগুলি নকশায় প্রাধান্য পায় সেগুলি ব্রতীর গৃহআশ্রয় জাতীয় চিত্র। তাই এখানে যোল ঘর, গোয়াল ঘর, শিবের ঘর, পিটুলীর রান্নাঘর, আট ঘাট, নাট মন্দির, জোড়াবাঙলা প্রভৃতি চিত্র অংকিত হয়। এই হল একটি পূর্ণাঙ্গ গৃহের চিত্র—অন্ততঃ ব্রতীর জীবন অভিজ্ঞতায়। একে সব মিলিয়ে একটি পরিপূর্ণ গৃহাঙ্গন বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের উপকরণগুলির মধ্যে আছে গুয়া বা সুপারী গাছ, কাঁকুনী গাছ, শর, বেনাগাছ, পদ্মফুল, অশ্বত্থ, বট, পাকা পান, বেগুন পাতা, ফুল গাছ ইত্যাদি নানাবিধ, বৃক্ষ-লতাবাচক চিত্র। এ সব উপকরণ ব্রতীর খুব পরিচিত। বাড়ীর আশেপাশেই থাকে এগুলি এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয়ও বটে।

পশু-পাখী বা প্রাণীবাচক উপকরণ দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ের চিত্রগুলি অংকিত হয়। এগুলির মধ্যে চড়া-চড়ি, উদ্‌বিড়ালী, পাখী, বসওযা প্রভৃতি ব্রতীর ইচ্ছানুযায়ী আলপনার অন্তর্ভুক্ত হয়। শব্দগুলি একালে কিছু পরিচিত. কিছু অপরিচিত হলেও চিত্র দেখে মনে হয়, এগুলি প্রাণীবাচকই বটে। অবশ্য ব্রতীর মনে নিশ্চয় তার যথাযথ রূপ অংকিত আছে।

গৃহ সামগ্রীর নানান উপকরণ নিয়ে চতুর্থ পর্যায়ের নকশাগুলি গড়ে উঠেছে। এই শ্রেণীর চিত্রই সংখ্যায় সর্বাধিক—১৮টি। এগুলির মধ্যে আম, কাঁঠালের দুই পিঁড়ি, সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু, ঢেঁকি, বাঁশের কোড়া, খাট-পালংক, তেকোনা পিদিম, ঘি-চন্দনের বাটি, পিটুলীর ঘরকন্না, আয়না, খ্যাংরা, বেড়ি, খোরা, দোলা, হাতা, বঁটি, ধানের ছালা, ধনের ছালা, কাজল-লতা প্রভৃতি। সংখ্যায় এগুলি আরও অধিক হওয়াই উচিত ছিল। কেননা ঘর সংসারে প্রয়োজনীয় ও উল্লেখযোগ্য বস্তুর তো অভাব নেই। সম্ভবতঃ এই ইচ্ছার শেষ নেই বলেই বোধহয় সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় এত বেশী চিত্রের রহস্যময় সমারোহ।

এই ব্রতের আলপনায় কিন্তু মানব জাতীয় চিত্রের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। এত যে ভোগ্য সামগ্রী, ঘর-বাড়ী, তৈজস-পত্র, তা মূলতঃ মানুষের জন্যই এবং তার পরে দেবতার জন্য। পঞ্চম পর্যায়ে এই শ্রেণীর মাত্র গুটি পাঁচেক চিত্র দেখা যায়। দেব মূর্তির মধ্যে ধাতা-কাতা-বিধাতা, অরুণ ঠাকুর ও লক্ষ্মীর পা প্রভৃতি এবং মানব মূর্তির মধ্যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ হল 'হাতে পো কাঁখে পো' মানুষ আর সেই সঙ্গে আছে, 'চেঁটি কর্কটি'—এর বিশ্লেষণ যথাসময়ে হবে। আর আছে 'কুঁচ কুঁচতি'।

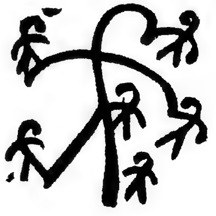

প্রকৃতিমূলক চিত্র খুব সামান্যই। যথাঃ চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ও গঙ্গা যমুনা নদী।

এগুলি কোন বিশেষ ইচ্ছাপূরণের প্রতীক, ব্রতীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এগুলি হল জীবনের উৎস স্থল, যা নিয়তই তাকে দেখতে হয়। এর সঙ্গে অন্যান্য প্রভাবশালী প্রাকৃতিক শক্তি অর্থাৎ মেঘ, বৃষ্টি, বজ্র, বন্যা প্রভৃতি থাকলে ভাল হত। কিন্তু সে তো আর ব্রতীর দৈনন্দিন জীবন চর্যার মধ্যে পড়েনা। এই সব উপকরণের বাইরে একটি অদ্ভুত উপকরণ হল থুৎকুড়ি। এটি কোন শ্রেণীভুক্ত নয়।

উপরোক্ত তালিকার মধ্যে যে শব্দগুলি ইদানীং অপ্রচলিত, সেগুলির অর্থ-বোধের জন্য দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থটির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ, দোলা অর্থে পালকী এ কথা গ্রাম সমাজে খুবই প্রচলিত। অবশ্য, 'ডুলিয়ে যা নিয়ে যাওয়া হয়' এই অর্থে ডুলিও হতে পারে। যথা: 'বাজতে বাজতে চললো ডুলি, ডুলি গেল সে কমলা পুলি'—তবে চিত্রানুযায়ী এটি সম্ভবতঃ পালকীই। দ্বিতীয়তঃ, গুয়া গাছ হল সুপারী গাছ। যেমন গুয়া হাটা হ'ল গৌহাটি। কারণ ওখানে একদা সুপারীর কেনা বেচা বেশী হত। শব্দটি মূল উৎস সম্ভবতঃ 'গুবাক'। নজরুলের কবিতায় আছে, 'বাতায়ান পাশে গুবাক তরুর সারি।' কোন কোন ব্রতী বলে 'গো'—যতই হোক, এই সব শাব্দিক পরিবর্তন তো লোকশ্রুতিরই ফল। তৃতীয়তঃ, গুবা গাছের বিকল্পরূপে তালিকায় আছে 'কাঁকুনী'—এটি কি ধরনের গাছ, সে সম্বন্ধে কোন হদিশ মেলে না। অবশ্য তাতেও এর বাস্তব পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা হয়না। চতুর্থতঃ, হাতে পা কাঁখে পো' কথাটি এখন প্রায় প্রবাদতুল্য হয়ে গেছে, যার অর্থ—যে নারীর হাতে-কোলে সন্তান অর্থাৎ অধিক সন্তানের জননী। সম্ভবতঃ উর্বরা শক্তির প্রতীক রূপে চিত্রটি অংকিত হয়ে থাকবে। পঞ্চমতঃ, ঢেঁটি শব্দটি অপভাষা শ্রেণীর—সম্ভবতঃ ঢ্যাঁটা এর পুংলিঙ্গ, যার চলতি অর্থ 'বাগ মানে না' এমন পুরুষ। সুতরাং এর স্ত্রীবাচক ব্যাখ্যাটি সহজেই অনুমেয়। অবশ্য এখানে তা 'সতীন' অর্থে ব্যবহৃত। ষষ্ঠতঃ, থুৎকুড়ি শব্দটি বিশেষ কৌতুহলো-দ্দীপক। ব্রতের মন্ত্রে বলা হয়: 'থুৎকুড়ি থুৎকুড়ি! সতীন যেন হয় আটকুড়ি॥' শুনে এর অর্থ বুঝতে পারা যায় না। বর্তমানে অপ্রচলিত এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল নিষ্ঠীবন বা চলতি কথায় থুথু। তাই এই মন্ত্রের আগে থ্যাংরা, বেড়ী, খোরা, হাতা প্রভৃতি রান্নাঘরের সামগ্রীর উল্লেখ থাকলেও এটিকে সেই শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব হবে না। শব্দটির একটি প্রাচীন প্রয়োগ 'আমাদের ঘরের

দুলাল' উপন্যাস থেকে উদ্ধার করা হল : 'চলতি পানসী চার পয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম নয়—একি থুৎকুড়ি দিয়া ছাতু গেলা ?' সপ্তমতঃ, অনুরূপ রহস্য-ময়তা আছে 'কুঁচ কুঁচতি' শব্দেও—এর সঙ্গে কুঁচবরণ এর কুঁচ জড়িত নেই। মন্ত্রে অবশ্য আছে, 'কুঁচকুঁচতি কুঁচই বোন। কেন রে কুঁচই এতক্ষণ ॥' তবু কুঁচকুঁচতি সত্য সত্যই ব্রতীর বোন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। অবশ্য সমগ্র আলপনায় নেতিবাচক মানব-সম্বন্ধ সতীন ছাড়া আর কোন মানব মূর্তির সাক্ষাৎ নেই। সেই বিচারে এটি মানব মূর্তি হতেও পারে। কেননা উপরোক্ত প্রশ্নের পর কুঁচই বোন সে প্রশ্নের জবাবও দিয়েছে মানুষী ভাষায়—ইতিপূর্বে আর কোন চিত্র-প্রতীকের ক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রশ্ন উত্তর দেখা যায়নি। তবে দক্ষিণারঞ্জন এই মন্ত্র বা ছড়ার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার সঙ্গে বক্ষ্যমান আলোচনাটি মিলবে না। তাই অনুসন্ধানী পাঠকের কাছে ছড়াটির অপর কোন ব্যাখ্যার সুযোগ থেকেই যায়। অষ্টমতঃ, 'বসওয়া' শব্দটি কোন্ দেশীয় তা বলা শক্ত। তবে আলোচ্য গ্রন্থে এর পাদটিকায় আছে, বলদ এবং শিবের ষাঁড়। তাই ব্রতী বলে : 'বসওবাটি পূজা করে ঘরে চলে যাই।'

ছয়

আলপনায় সংশ্লিষ্ট চিত্র বা প্রতীকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ'কথাই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, পরিপূর্ণ ভাবে ইহলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধির দিকেই এই ব্রত পালনে ব্রতীর দৃষ্টি। স্বভাবতই ব্রতীর অবস্থা দরিদ্র, তাই যা তার স্বপ্নের বস্তু অথচ চির-আকাঙ্ক্ষার, তাই সে এই চিত্রের মধ্যে সংযোজন করে কাল্পনিক সুখ শান্তিতে সাময়িক ভাবে আচ্ছন্ন থাকতে চেয়েছে।

লক্ষণীয়, যে চিত্রগুলি এখানে আঁকা হযেছে, তা সবই ব্রতীর জীবনের দু ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। প্রথমতঃ; তার চেনা-জানা জীবন ও দ্বিতীয়তঃ তার দেখা-শোনার জীবন। অর্থাৎ এখানে তার ইহলৌকিক সুখ-ভোগের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়বিধ অভিজ্ঞতার প্রকাশ হযেছে।

এই দুই অভিজ্ঞতার বাইরে তার জ্ঞান ভাণ্ডার নিতান্তই কম। তাই আকাঙ্ক্ষায় নদীর চিত্র থাকলেও, জলযান রূপে নৌকা বা জাহাজ অনুপস্থিত। দেবতার আলপনা আঁকলেও সে দেব-নিবাস রূপে পর্বত আঁকতে পারে না।

অধিক স্বচ্ছলতার প্রতীক রূপে দ্বিতল, ত্রিতল গৃহ সে কল্পনায় আনতে পারেনা। অথচ মূল্যবান সাজ পোষাক, সোনা-দানার অলংকার ইত্যাদি কখনই তার চিন্তা বা আলপনায় ঠাঁই পায় না—যদিও মন্ত্রের উচ্চারণে সে এই ক্ষতিপূরণ করে নেয়। এর কারণ হতে পারে যে এই সব বস্তু তার চিন্তা বা কল্পনায় আসে না। তাই সর্বসাধারণের কাছে এগুলি প্রার্থনীয় হলেও ব্রতীর কাছে তার কোন আবেদন নেই।

গৃহ-বসতিমূলক চিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেখানে সমৃদ্ধ গৃহস্থের জন্য সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। বসত বাড়ী রূপে শুধু ষোল ঘর যুক্ত প্রাসাদ-তুল্য বাড়ীই নেই। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যুক্ত হয়েছে উপাস্য দেবতার ঘর, নাটমন্দির এবং তার স্থাপত্য হবে জোড়া বাঙ্গলা রীতির, রান্নাঘর ইত্যাদি। বাসগৃহের যখন এত বিপুল আয়োজন তখন তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জলাশয়টি যে বিরাট হবে তা বলাই বাহুল্য। কত বিরাট তার উল্লেখ না থাকলেও আট ঘাট দ্বারা তা বোঝানো হয়েছে। তার আট দিক থেকে নেমে জল ব্যবহার করা যাবে।

ব্রতীর ইচ্ছানুযায়ী গৃহের চতুর্দিকে যে সব বৃক্ষ লতার সমাবেশ হয়েছে তাও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এগুলি সবই তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। দৈনন্দিন জীবনে অশ্বথ বটের প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও তা যে প্রতি বাড়ী থাকা সম্ভব নয়—একথা ব্রতী জানেন। কিন্তু ব্রতের আলপনায় এদের প্রযোগ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ ছাড়া গৃহ নির্মাণে শর, বেনাগাছ যে প্রয়োজনীয় এবং যা ব্রতীর আয়ত্বের বাইরে, তাকে তো আলপনায় ঠাঁই দিতেই হয়।

প্রাণীবাচক অলংকরণগুলি একান্ত ভাবেই ঘরোয়া। এই সব কীট-পতঙ্গ, পাখী, প্রাণী নিয়েই গ্রাম্য জীবন। লক্ষণীয় যে, এই পর্যায়ে অত্যন্ত পরিচিত উপকারী গৃহপালিত পশু-প্রাণী অর্থাৎ হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল, মহিষ ইত্যাদির উল্লেখ নেই। মনে হয় ব্রতী যেন তার গোপন মনস্কামনা পুরণের জন্য এইসব উপকারী পশু প্রাণীকে ব্যবহার করতে চান না। পরিবর্তে যেগুলি তত উপকারী নয় বা কিছুটা ক্ষতিকারক, সেগুলিকে ব্রতী অভীষ্ট সাধনের মাধ্যম রূপে বেছে নিয়েছেন। সম্ভবতঃ যাদুক্রিয়া বা কৃষ্ণযাদু চর্চার ফলে ব্রতীর মনে এই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণকারী নিষেধাজ্ঞা জন্ম নিয়েছে। তাই আলপনায়

উল্লিখিত পশু প্রাণীর প্রতি নেতিবাচক পরিচিতি এবং অনুল্লিখিত প্রাণীগুলির প্রতি তার ইতিবাচক পরিচিতি আছে—এ কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

গৃহ সামগ্রীর অন্যান্য উপকরণগুলিই গৃহস্থের সমৃদ্ধ জীবনের ইঙ্গিত করে। এইসব চিত্রের দ্বারা একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ সমৃদ্ধির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে—সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু, খাট পালংক, ঘি-চন্দনের বাটি, আম-কাঠালের পিঁড়ি, দোলা, ধনের ছালা, ধানের ছালা—তেমনি অপর দিকে পরোক্ষ সমৃদ্ধির প্রকাশ হয়েছে পিটুলীর থালা, পিটুলির রান্নাঘর জাতীয় প্রতীক দ্বারা। লক্ষ্যণীয় যে আলপনায় উল্লিখিত যত কিছু উপকরণ বা চিত্র, সবই যখন পিটুলির দ্বারা আঁকা তবে থালা, গোয়াল, রান্নাঘর প্রভৃতির জন্য পৃথক ভাবে পিটুলি শব্দের ব্যবহার কেন ?[১৫]

সর্বাপেক্ষা কৌতূহলের প্রশ্ন জাগে এত যে ভোগ-বিলাসের সমারোহ—এ কাদের জন্য! তাদের উল্লেখ কোথায় ? মানুষ যদি এর কেন্দ্রবিন্দু হয়, তবে তারা ব্রতীর আলপনায় প্রাধান্য পায় না কেন ?

এ ব্যাপারে ব্রতী অত্যন্ত সচেতন। এই যে ভোগ্য সামগ্রী, এ সবই সম্ভব হবে দেব-কল্যাণে। তাই ইতিপূর্বে শিবের ঘর নির্মিত হয়েছে। এবারে এসেছে ধাতা, কাতা, বিধাতা নামক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তার রূপ-চিত্র। এ ছাড়া দেব-মহিমাবাচক চিহ্ন—লক্ষ্মী দেবীর পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়, তাঁর পদচিহ্ন মাত্র ও অরুণ ঠাকুর। শেষোক্ত দেবতা অবশ্য বহু ব্রতেই আলপনা ও মন্ত্রে পূজিত হন। বিভিন্ন স্থানে তাঁর নাম বিভিন্ন : ইতু, রাল, অরুণঠাকুর প্রভৃতি।

সুতরাং এত যে ভোগ্য সামগ্রী—তার মূল উৎস হল দেবতা, তাকেও তো ব্রতের মাধ্যমে উপযুক্ত ভাবে স্মরণ করা হল। এত সব কাণ্ডের পরে আসে মানুষ অর্থাৎ চিত্রে উল্লিখিত 'হাতে পো কাঁখে পো।' এ ছাড়া আছে আর এক মনুষ্য মূর্তি 'ঢেঁটি'। ইনি হলেন সতীনের প্রতীক। স্বভাবতই সামাজিক ধারণা ও নিয়ম অনুযায়ী ইনি মোটেই ব্রতীর অভিপ্রেত নন। অর্থাৎ সমগ্র আলপনার মধ্যে এই একটি চিত্র সর্বাংশে পরিত্যাজ্য,—চরম নেতিবাচক চরিত্র। কৈন-এর সংযোজন তা বোধ হয় আর বিশদ ভাবে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সকল অভিলাষই তার স্বনাম নিয়ে চিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে, একমাত্র সতীনই উপস্থাপিত হয়েছে অপভাষার মাধ্যমে। সুতরাং ব্রতীর মনে তার সম্বন্ধে ধারণা কিরূপ তা সহজেই অনুমেয়।[১৬]

এই বিশাল ভোগ্য-সামগ্রীর পরিপ্রেক্ষিতে মাত্র একজন মানব মানবী ব্রত পালনের সূচীতে পূজার সময় তার স্থান হল উনবিংশ : 'হাতে পো কাঁখে পো। আমার পৃথিবীতে না পড়ে গো ॥'

যে অতৃপ্ত কামনা-বাসনা পূরণের জন্য এই ব্রতের উদ্যোগ, সেই কামনা-বাসনার অধিকারী মানুষটিকে এত পরে পূজা মঞ্চে নিয়ে আসা হল কেন—এই প্রশ্ন উঠতেই পারে।

এই প্রসঙ্গে ইহুদী পুরাণে সৃষ্টি কাহিনীর কিছু অংশ স্মরণ করা যাক। সেখানে আছে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর সদাপ্রভু প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। ক্রমে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সৃষ্টি করে দিবস ও রাতকে পৃথক করলেন। তারপর স্থল ও জলের সৃষ্টি। স্থলের ওপর নানাবিধ বৃক্ষ লতা ও তাদের কর্তৃত্ব করার জন্য অসংখ্য প্রাণী-পশু। আকাশে কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য পাখী এবং জলে কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য নানাবিধ জলচর প্রাণীর সৃষ্টি হল। এইসব করতে কেটে গেল সৃষ্টির প্রথম পাঁচ দিন। তখন স্রষ্টা সদাপ্রভু ভাবলেন, এত যে করলাম, এ সব কার জন্য? ভোগ করবে কে এ সব? তখন ষষ্ঠ দিনে তৈরী করলেন মানব সন্তান। সে দিনটা ছিল শুক্রবার।[১৭]

সেই আদিম মানব-মানবী হলেন আদম ও ঈভ—তারাই পূর্বে উল্লিখিত যাবতীয় ভোগ্য-সামগ্রীর অধিকারী হলেন।

আলোচ্য আলপনা অংকনের ক্ষেত্রেও যেন সেই একই ক্রম অনুসৃত হয়েছে। প্রথমে ভোগ্য বস্তুর বিন্যাস, এর পরে কে তার অধিকারী তার পরিচয় স্থাপন।

শুধু বাইবেল নয়, কোরান-পুরাণের নানান বিচিত্র কাহিনীতেও মানব সৃষ্টি হয়েছিল সবার শেষে—সেই রকমই উল্লেখ আছে। তাই মনে হয় ব্রতী যেন নিজের অজ্ঞাতসারে সৃষ্টিকর্তার সেই বিজ্ঞান ধর্মীতাকেই মেনে নিয়েছেন—যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা দিয়েছে আলপনা আঁকার ক্ষেত্রেও।

সাত

অংকনের যতগুলি পদ্ধতি, শ্রেণী বিভাগ বা চরিত্র বৈশিষ্ট্য আছে, আলপনার অংকন পদ্ধতি তার থেকে সবিশেষ ভিন্ন। তার মধ্যে এই ব্রতের আলপনা আঁকা আরও বিচিত্র।

সেঁজুতি আলপনা

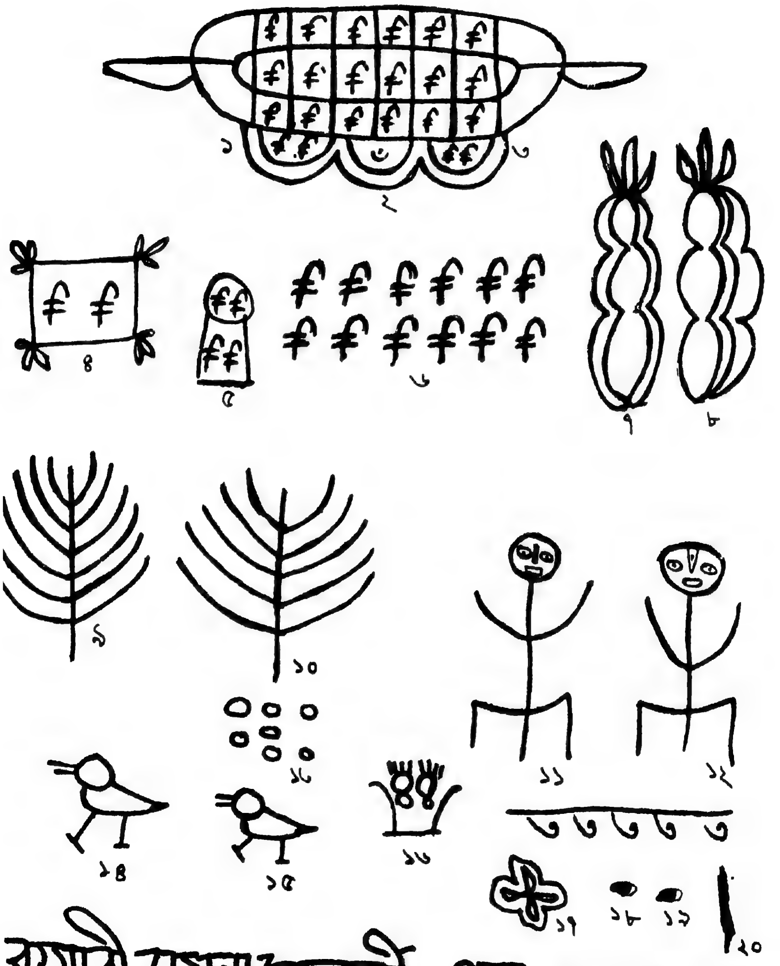

কুমারী চায়না চক্রবর্ত্তী গ্রাম = আসনপুর

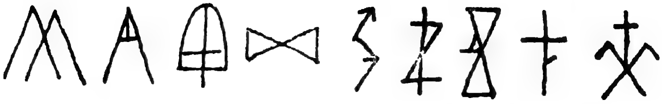

বর্তমান প্যালেষ্টাইনের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে পাওয়া খ্রীষ্টপূর্ব ৯০০০ বৎসর পূর্বের ইঁটের উপরের লিপি

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার চিত্রাক্ষর বা হায়ারোগ্লিফ

দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী সমাজে প্রচলিত 'ক্রুশ-চিহ্নিত' যাদু নকশা

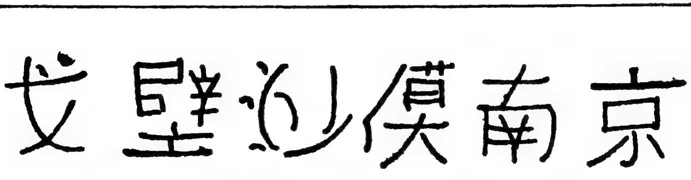

চৈনিক বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষর—প্রায় সাংকেতিক চিহ্নের মত

বিভিন্ন লিপি ও সংকেত চিত্র

শিল্পশাস্ত্রে পারঙ্গম ব্যক্তি এক কথায় বলে দেবেন এগুলি লোকশিল্প না লোকচিত্রকলা। কিন্তু তাতে এই অংকন পদ্ধতির শ্রেণী বা চরিত্র নিরূপণ করা হল না। লোকচিত্রকলা যখনই চিত্রকলায় পরিণত হয়েছে, তখনই তার মধ্যে এসেছে নানা শ্রেণী, নানা বৈশিষ্ট্য এবং নানা পরিচয়।

সুতরাং যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতিতে বলতেই হয় যে আধুনিক চিত্রকলা বা শহুরে চিত্রকলার মূল সূত্র অবশ্যই একদা নিহিত ছিল লোকচিত্রকলার মধ্যে, এবং যেহেতু আলপনা লোকচিত্রকলার একটি বিশেষ অঙ্গ—তাই পরবর্তী কালের শহুরে চিত্রকলায় তার প্রভাব থাকা একান্ত স্বাভাবিক।

শিল্পশাস্ত্রী যখন অ্যাবস্ট্রাক্ট, কিউবিজম্‌, সুররিয়ালিজম ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করেন আধুনিক চিত্র বিশ্লেষণের জন্য, তখন তিনি করেন তার আধুনিক শিক্ষার মন নিয়ে। এর পটভূমি রূপে থাকে শিল্প দর্শন, শিল্প ইতিহাস, শিল্প ঐতিহ্য ইত্যাদি। এগুলি আরও বিশদ করলে একটি বিশেষ তথ্য প্রকাশ্য হয়: তা হল চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ।

ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের চরম প্রকাশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে হয়েছে—সংস্কৃতির ইতিহাসকে তা বহুবার বহুভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই সাহিত্যে এসেছে নিয়ম ভেঙে চতুর্দ্দশপদী কবিতা তথা সনেট, এসেছে ছোট গল্প। গাথা-উপাখ্যান-মহাকাব্য ইত্যাদির ধারা পরিবর্তন করে দেখা দিয়েছে গীতিকবিতা। এমনতর বহু পরিবর্তন বা প্রকরণ দেখা দিয়েছে নাটকেও। প্যাসন প্লে, অ্যাবসার্ড ড্রামা, মনোলগ ড্রামা ইত্যাদি সেই নিয়ম ভাঙ্গারই প্রকাশ। নাট্য প্রযোজনাতেও এসেছে থার্ড থিয়েটার, মুক্তমঞ্চ ইত্যাদি বহুবিধ প্রকরণ।

এ সবই হল মূলতঃ ব্যক্তির নান্দনিক চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের চরম প্রকাশ। পুরাতন ধারা বা শৈলীকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের চরম বিরোধ।

এই পটভূমিতে বিচার করলে লোকচিত্রকলাতে সে জাতীয় ব্যক্তিগত চরিত্র বা দক্ষতার প্রকাশ কখনও তত প্রকট হয়ে ওঠেনি। স্থান বিশেষে 'ঘরানা' শব্দটি প্রযোজ্য হতে পারে মাত্র—এর বেশী নয়।

সেকালের নিরক্ষর শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে লোকচিত্রকলার বিভিন্ন প্রকরণকে অবশ্যই লৌকিক রীতি-নির্ভর ভিন্ন ভিন্ন শিল্পসঙ্গত নাম দেওয়া যেতে পারে।

একটি বা দুটি আঁচড়ে মনের ভাবকে প্রকাশ করা—এটা যথেষ্ট কঠিন কাজ। স্থুল ভাষায় এটাকে স্কেচ বলা যেতে পারে। প্রথম শব্দটি চিত্রকলার ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয় শব্দটি প্রয়োগধর্মী চিত্রকলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রচলিত।

সেঁজুতি বা এই জাতীয় ব্রতের আলপনার আঁকার ধরণ দেখে মিশরীয় চিত্রাক্ষর বা হায়ারোগ্লিফ লিপির কথা মনে আসতে পারে। সেখানে অক্ষর লেখার ধরণ ছিল ইঙ্গিতময়—কিছুটা বা চিত্রময়।

চীন বা জাপান দেশের অক্ষরের গঠন নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তারাও সেগুলির চিত্রময়তার দ্বারা আকৃষ্ট হন।

মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ বা চীন জাপানী অক্ষর—উভয় ক্ষেত্রেই একটি সাদৃশ্য আছে যে, এগুলি কোনটাই 'একক' অক্ষর নয়—গুচ্ছ অক্ষর বা অক্ষর সমষ্টি। বিশদভাবে বলতে গেলে কখনও কখনও এগুলি বিশেষ একটি শব্দের দ্যোতনাও বহন করে।

এক এক সময় তাই মনে হয় এগুলি অক্ষর লিখন নয়। অক্ষর অংকন বা চিত্রায়িত অক্ষর। একদিন মানুষ অক্ষরের ব্যবহার জানত না—জানতো অংকনের ব্যবহার। তাই ভাব প্রকাশের জন্য 'অংকন'-এর মাধ্যম ব্যবহার করেছিল। যাকে ইংরাজীতে স্থূলভাবে বলা চলে 'ডায়াগ্রামাটিক স্কেচ'।

অংকন থেকে অক্ষরের স্তরে আসতে সময় লেগেছে বহুদিনের। বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে আজ 'ক' নামক নকশাটিকে আমরা 'ক' অক্ষর বলছি। 'ক' অক্ষরের যে গঠন—তাও নাকি সংস্কৃত শাস্ত্র অনুসারে। কোন এক প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে বাঙ্গালা অক্ষরের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা আছে।[১৮]

কিন্তু তা যে একান্ত বিমূর্ত, এ' সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কেননা বাস্তবের কোন কিছুর সঙ্গেই তার সাদৃশ্য নেই। তাই বর্ণ পরিচয়ের চিত্রানুযায়ী বেশ কিছু চিত্র-সম্বলিত বা চিত্রের মাধ্যমে আঁকা অক্ষর শিশুর মনে সহজেই দাগ কাটে। তাই 'ং' বোঝাতে ঢাল-তরোয়াল, চন্দ্রবিন্দু বোঝাতে আকাশের চাঁদ-তারা, পিঠে পুঁটুলি নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকা লোককে 'ঞ'—ইত্যাদি চিত্রায়িত অক্ষরগুলি শিশুর কাছে বিশেষ আদরণীয়। তাই একটি বিশেষ অক্ষর কার রূপ প্রকাশ করছে তা বোঝা খুব কঠিন। তুলনায় একটি চিত্রাক্ষর অনেক বেশী ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য সে ক্ষেত্রে তাকে একটি অক্ষর না বলে অক্ষর সমষ্টি বা শব্দ বলাই ভাল।

এ' প্রসঙ্গে অনেকেরই শিশুকালে পাঠশালে বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

বিদ্যাভ্যাসের দিনগুলির কথা মনে হতে পারে। তখন 'ষ' এর জনপ্রিয়তা ছিল 'পেট কাটা ষ'-এর দ্বারা এবং 'র' লিখতে কখনই ভুল হত না। কারণ তার পরিচয় ছিল 'ব-য়ে শূন্য র' এবং অনুরূপভাবে 'ড়' ও হত 'ড-য়ে শূন্য ড়'। আর 'দ'-এর ত্রিভঙ্গ চেহারা থেকেই তো প্রবাদ হয়েছে 'হাড় ভাঙ্গা দ', সেই সঙ্গে মনে পড়ে 'পাগড়ী মাথায় 'ঙ'। প্রতিটি অক্ষরের এই চিত্র তৈরীর মূলে শিশু মন কাজ করেছে। অক্ষরের পরিচয়কে সনাক্ত করার জন্য সে তার পরিচিত জগতের সঙ্গে তাকে যে কোন ভাবে যুক্ত করে নিয়ে নিজের পাঠ্যাভাসকে আনন্দময় করে তুলেছে।[১৯]

এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি মন্তব্য করা হয় যে হায়ারোগ্লিফ বা চীনা-জাপানী অক্ষর বা প্রতিটি ভাষার প্রতিটি অক্ষর তো মূলত একটি নকশা। তবে একটি নকশার অজস্র অর্থ হতে পারে—ফলে এর মধ্যে ভ্রান্তি আসতে পারে সহজেই।

আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক মন সে ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রতিটি অক্ষরের (যা প্রাচীনকালের নকশা বা চিত্রের সমতুল্য) অর্থকে একটি নির্দিষ্ট সীমায় বেঁধে দিয়েছে। ফলে আদিম গুহাগাত্রের বা মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ বা চিত্রাক্ষর-এর ব্যাখ্যায় ভ্রান্তি হলেও, আধুনিক অক্ষরের ব্যাখ্যার ব্যাপারে ভ্রান্তি কম।

একটি পালকী, একটি কাজল লতা, একটি সূর্য, একটি মাছ—এগুলি চিত্র নয়, প্রকৃত বস্তুর প্রতিরূপ মাত্র—যথাসম্ভব কম রেখায় আঁকা। এটাই হল সেঁজুতি ব্রতের আলপনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

অন্যান্য ব্রতের আলপনার মত, সেঁজুতি ব্রতের আলপনাতেও ফুল লতা-পাতা বা চাঁদ-সূর্য তারা ইত্যাদি জাতীয় প্রথানুসারী অলংকরণ থাকলে, আলোচ্য নিয়মে এই আলপনার অংকন রীতির ব্যাখ্যা সম্ভব হত না। কারণ এগুলি প্রায় সময়েই কোন না কোন প্রকৃত বস্তুর আলংকারিক রূপ মাত্র হলেও, অন্য অর্থে পৃথক একটি শিল্প সৃষ্টিও। ব্রতী ছাড়া অন্য ব্যক্তিও তা থেকে রস আহরণ করতে পারবে বা সাধারণ চিত্রকলার দৃষ্টিতে তার বিচার করা সম্ভব।

তাই কলা ছড়ার আলপনা, খুন্তিলতা, খই, চিরুণীলতা, শংখলতা, কলমীলতা, চালতালতা—বিভিন্ন ব্রতে বা শুভ কাজে ব্যবহৃত এইসব আলপনা একদিকে যেমন ব্রতের নিয়মানুযায়ী অংকিত হয়েছে, অপরদিকে সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিশেষ ধরনের শিল্প রচনাও করেছে। সেক্ষেত্রে দর্শক ব্রত বা ব্রতীর

কথা না জানলেও, আলপনার এ' ধরণের দৃষ্টিরম্যতাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না।[২০]

উপরোক্ত কোন নিয়মেই সেঁজুতি ব্রতের আলপনার সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়। গূঢ় অর্থে—এগুলি প্রতীক চিত্র। কিন্তু সেটা শুধু ব্রত পালনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী। সাধারণ অর্থে এগুলি বাস্তবের নিখুঁত অনুকৃতি মাত্র এবং বিনা তর্কে বলা চলে যে স্বল্পতম রেখার একটি বস্তুর অনুকৃতি অংকন।

তাই এগুলির মধ্যে বিমূর্তভাব যতটা, তার চেয়ে বেশী আছে বাস্তবকে মূর্ত করণের প্রচেষ্টা। বস্তু বা ভাবের সংক্ষিপ্ত রূপ এর বৈশিষ্ট্য হলেও তা একই সঙ্গে যথেষ্ট বিশদও বটে। প্রতীক বা রূপক এর মাধ্যম হলেও, সাধারণের কাছেও তার রস-নিবেদন যোগ্যতা আছে।

নিরক্ষর জনমানসে তাই এই অংকন পদ্ধতির এক বিশেষ মূল্য আছে। এই আলপনা অংকন একদিকে যেমন তার শৈল্পিক চিন্তার প্রকাশ, অপরপক্ষে তার এবং তার পরিজনের পক্ষে লোকশিক্ষার সহায়ক। নিরক্ষর বলেই ব্রতী নিজের অজ্ঞাতসারে অক্ষরহীনতার দ্বারা অসংখ্য অক্ষর বা একটি শব্দের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে পারেন একটি ছোট অংকনের দ্বারা। সাক্ষর হলে তা সীমিত হয়ে যেত একটি মাত্র নির্দিষ্ট অক্ষরের দ্বারা—যা কোন পূর্ণ বস্তুর প্রতীক হত না বা একটি পূর্ণ শব্দ হয়ে উঠতে পারত না। সেদিক থেকে ব্রতীর নিরক্ষর মন লোক-শিল্প ও লোকশিক্ষার প্রচারকে একাসনে বসিয়েছে এবং সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলার সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সংহতি রক্ষার চেষ্টা করেছে।[২১]

তথ্যসূত্র :

[১] ঠানদিদির থলে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। পৃঃ ৩, ১২, ২২, ৩৭-৩৮ ইত্যাদি।

[২] বারো মাসে তের পাবণ। স্বামী নির্মলানন্দ। পৃঃ ২৩

[৩] আলিম্পন। দুর্গা মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৪০

[৪] ঠানদিদির থলে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার পৃঃ ৮৯

[৫] আলিম্পন। দুর্গা মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ১১-১২

[৬] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। ১৩১৩ বর্ষের ১ম সংখ্যা

[৭] ঠানদিদির থলে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। পৃঃ ৮৮

[৮] Alpona—Tapan Mohan Chattopadhyaya.

[৯] ব্যক্তিগত সমীক্ষা। মেদিনীপুরের (গ্রাম : ঠেকুয়াচক, ডাক : কুমারচক) অজিত পটিদার সঙ্গে সাক্ষাৎকার

[১০] বাঙ্গালীর ইতিহাস। আদিপর্ব। নীহাররঞ্জন রায়। পৃঃ ৫৮০

[১১] ঠানদিদির থলে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। পৃঃ ৯৫

[১১(ক)] বঙ্কিমচন্দ্র ও লোকসংস্কৃতি। ডঃ বেলা মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ১৫৭

[১২] বাংলার লোক সাহিত্য। ৪র্থ খণ্ড। আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃঃ ৫৫

[১৩] লোক সাহিত্য। আশরাফ সিদ্দিকী। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৩০৩, ৩১১

[১৪] বর্তমান বঙ্গসমাজে যাদুবিদ্যা ও লোকায়ত বিজ্ঞানের ধারা। শোভারাণী চক্রবর্তী। পৃঃ ২৮, ৮৫, ১৪৬, ১৬৮, ১৭১ ইত্যাদি

[১৫] ঠানদিদির থলে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। পৃঃ ১০৬

[১৬] বারো মাসে তের পার্বণ। স্বামী নির্মলানন্দ। পৃঃ ২৬

[১৭] বাইবেল। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট। আদি পুস্তক। ১ম ও ২য় অধ্যায়

[১৮] বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। রামগতি দেবশর্মা। পৃঃ ২

[১৯] পল্লীচিত্র। দীনেন্দ্র কুমার রায়। পৃঃ ২৭

[২০] বাংলার ব্রত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৫৮, ৬৬, ৬৭ ইত্যাদি

[২১] বাংলার লোক সাহিত্য। ১ম খণ্ড। আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃঃ ৭৯

পট-পটুয়ার পাঁচালী

এক

একদিকে জবরদস্ত পোষাক পরিচ্ছদ পরিহিত পূর্ণাঙ্গ আয়তনের চেয়েও বড়ো মাপের রাজকীয় ফ্রেমযুক্ত এক বিদেশিনী মহারাণী—বৃটিশ রাজবংশীয়দেরই কেউ হবেন সম্ভবতঃ, আর অপরদিকে অনুরূপ আর এক রাজপুরুষ। সম্ভবতঃ ভারতের বৃটিশ রাজের প্রতিনিধি বা অনুরূপ কেউ, তবে পোষাকে ব্যক্তিত্বে কেউই কম যান না।

এই দুই রাজকীয় মহামূল্য তৈলচিত্র, তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মেদিনীপুরের পুলিন চিত্রকর সত্যপীরের পাঁচালী গাইছিল :

'শুনহ ভকত লোক হয়ে একচিত
সত্যপীর সাহেব সবার করে হিত।
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি নারায়ণ
শুন গল্প আপনি আসরে দেহ মন।
ভক্ত না একের তরে মোকেদ হইয়া
আসিয়া দেখহ পীর আসরে বসিয়া।'

মাথার উপরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সেই উঁচু গোলাকার ছাদ, শ্বেত পাথরের সুন্দর কারুকাজ করা। এই ছাদের ঠিক উপরেই আছে সেই সিঙ্গাধারী পরীমূর্তি—মেঘের পটভূমিতে যে মূর্তির ছবি তুলে অনেকেই এ' যাবৎ শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রীর সম্মান পেয়েছেন।

বিরাট হলঘরের মধ্যে পটুয়ার অনভ্যস্ত কণ্ঠস্বরটাও মাইকের মাধ্যমে বেশ গম গম করছিল। গান গাইছিল সে দ্রুত লয়ে আর বাঁ হাত দিয়ে পটগুলিকে গুটিয়ে গুটিয়ে নিচ্ছিল ধীর লয়ে—কারণ গানের বিবরণের তুলনায় পটের চিত্র-সংখ্যা অনেক কম।

একটা বিশেষ ধরণের জোরালো আলো এসে পড়েছিল ওর হাতের ছবির ওপর—যেন দর্শকরা তার পটের বিষয়বস্তু ভাল করে দেখতে পান। সেই উজ্জ্বল

আলোয় পটিদার, তার পটচিত্র আর প্রদর্শন ভঙ্গি—সবই বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা।

পুলিন যা গাইছিল তার অনেক কিছুই পটের মধ্যে ছিল না। যেটা ছিল না সেটা আমাদের কল্পনা করে নিতে হচ্ছিল—কারণ আমরা সবাই শহুরে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী দর্শক।

সত্যপীরের গান শোনবার পর সে পটের গোছাটা বেশ সুন্দর করে গুটিয়ে নিয়ে নাইলনের ব্যাগে ভরল।

তারপর সামনে এসে দাঁড়াল ওর জামাই রঞ্জিত চিত্রকর। সে এবারে গাইবে চণ্ডীমঙ্গলের গান। ও গাইল, ওর শ্বশুর ওকে সাহায্য করল। সবাই শুনলাম শেষ পর্যন্ত—বড় ভাল লাগল।

নাইবা থাকল তেমন সুর বা তাল। চণ্ডীমঙ্গলের দুটো কাহিনীকে এক করে বিরাট কাব্যটাকে ছবির ফ্রেমে ধরতে হয়েছে তো। তবে কালকেতু ব্যাধের কাহিনীটা অতি সংক্ষেপে সেরে রঞ্জিত পটুয়া তাড়াতাড়ি চলে গেছে ধনপতি সদাগরের গল্পে।

গান-টান শেষ হয়ে গেলে, ধরলাম পুলিন চিত্রকরকে। ও তখন তার পটের গোছাগুলো ধীরে সুস্থে গুটিয়ে হিসাব মিলিয়ে রাখছিল। ওর সঙ্গে ছিল তার ছোট ছেলেটা—গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে পড়ে। দেখলাম ব্যাগের মধ্যে জড়ানো দীঘল পট বোঝাই—ছোটবড় মিলিয়ে সংখ্যায় অন্ততঃ খান-পনেরো তো হবেই।

জিজ্ঞাসা করতে শুধালো 'না, সবগুলি গাইনি। তবে বেশী করে এনে-ছিলাম। কি জানি যদি বাবুরা শুনতে চান। বিক্রী-টিক্রী যদি হয় দু' একটা। শুনেছি কলকাতার বাবুরা এসব পছন্দ করেন। তাছাড়া ওঁরা তো আর বলেননি যে কতগুলো—

ওঁরা মানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কর্মকর্তারা। তাঁরাই এদের চিঠি দিয়ে আনিয়েছেন। তাই পুলিন বিহারী চিত্রকর ও তস্য জামাতা রঞ্জিত চিত্রকর এসেছিল মেদিনীপুরের পিংলা অঞ্চল থেকে—এই পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা সহরের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের হলঘরে।

এবং যেহেতু এই অনুষ্ঠানের একটি বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম সংবাদপত্রে, তাই অন্যান্য অনেকের মত আমিও সময় মত হাজির হতে পেরেছিলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেকের মত গান গেয়ে ওরা পেল মাত্র একশো টাকা।

পুলিন পটিদারের সেই পট বিক্রীর কথাটা মনে ছিল। সেই সূত্র ধরে জিজ্ঞাসা করি, 'একটা কিনব ভাল দেখে, হবে নাকি?'

বলা মাত্রই খুব উৎসাহের সঙ্গে ব্যাগের মধ্যে গুটিয়ে রাখা পটগুলি সে মেলে ধরতে উদ্যত হল। আমি বললাম—'না, বাইরে এসে কথা হবে।'

ততক্ষণে হলঘরের শ্রোতারা সবাই চলে গেছে। আমরা দু' চারজন আগ্রহী ব্যক্তি রয়ে গেছি ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলব বলে। বিশেষভাবে আয়োজিত আলো, প্ল্যাটফর্ম, মাইক ইত্যাদি সবই ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এতবড় সুসজ্জিত হলঘরটা একটু পরেই নিকষ আঁধারে ভরে যাবে। এই রাজকীয় পরিবেশ কোনদিনই কোন অরাজকীয় ব্যক্তিকে মনে রাখবে না।

হলঘরের বাইরে এসে বিরাট চওড়া চওড়া সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ওর সঙ্গে তখন বৈষয়িক কথাগুলি সেরে নিচ্ছিলাম। বেশী কথার বিনিময়করতে হলনা—মোটামুটি অল্প দামেই ও আমাকে দিল চণ্ডীমঙ্গলের দীঘল পটটা।

সত্য বলতে কি ওর কাছে আরও নানা ধরণের পটই ছিল। তাতে রাম রাবণের ব্যাপার ছিল। ধর্ম ঠাকুরের গল্প ছিল,—এমনকি ছিল শাশুড়ী-বধূর সামাজিক কোঁদলের গল্পও। মনসা মঙ্গলের কাহিনীও বোধ হয় ছিল একটা। কিন্তু কেন জানি না, চণ্ডীমঙ্গলের পটটাই আমাকে বেশী আকৃষ্ট করল—হয়তো ক্ষণপূর্বে তা নিজের কানে শুনেছি বলেই কিংবা তার ছবিগুলি আঁকার ধরণ ভাল ছিল হয় তো।

কথা বলতে বলতে আমরা ফুল ফোটানো বাগানের মোরামের পথ দিয়ে চলে এসেছিলাম রাজপথের কাছাকাছি।

রাস্তার সেই অনুজ্জ্বল আলোতেও দেখেছিলাম পট গুলির আঁকার ভঙ্গি অবিকল দেশজ কালীঘাটের পটের মতই। সেই টান, সেই ছাঁদ। রংয়ের ধরণটাও বোধ হয় একই ধরণের। 'তবে সবই পালটে যাচ্ছে'—বলছিল পুলিন পটিদার।

কথায় কথায় বলেছিল, 'এর চেয়েও ভাল পট ঘরে আছে, পথে নিয়ে বেরোই না। অনেক দাম কে অত দাম দেবে বলুন! আপনি যদি বলেন তো না হয় ভাল দেখে একখানা—'

আশ্চর্যের ব্যাপার—পটের বিষয়বস্তু, গায়নভঙ্গী ইত্যাদি সবই কেমন সেকেলে। তাতে একালের কোন প্রভাবই নেই। তেমনি তার রং তুলি—দেশীয় পদ্ধতিতে পাথর-মাটি-গাছ-পাতা-ফুল থেকে সংগৃহীত। এ ব্যাপারে এঁরা এখনও বাজারী রং-এর শরণাপন্ন হন নি।

শুধু জিজ্ঞেস করা হল না, যে তুলি দিয়ে ওরা ছবি আঁকে, তা' বাজার থেকে কেনা, না হাতে তৈরী। সম্ভবতঃ দেশীয় প্রথায় তৈরী।

ভাবতে অবাক লাগে চণ্ডীমঙ্গলের অত বড় উপাখ্যানটিকে অদ্ভুত ভাবে মাত্র আঠার খানা দীর্ঘ ছবিতে ধরে রাখা হয়েছে। স্বভাবতই সব কটিই নির্বাচিত দৃশ্য এবং বলা বাহুল্য যে গল্পের এই ঘাটতি গান দিয়ে পুরিয়ে দেওয়া হবে। একটি বাদ দিয়ে অন্যটি যে ব্যর্থ—সে কথা মনে রাখলে, ছবির স্বল্পতার কথা মনেই আসে না।

বিষয়টি একটি বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। 'সেতু-বন্ধন' পটচিত্রের সুরুতে যে চিত্রটি আছে, তার গানের বয়ান হল নিম্নরূপ :

"বৃক্ষতলে রাম লক্ষ্মণ করিছে শয়ন
হেন কালে জটায়ু পাখী দিল দরশন
'আঁখি মেলে চেয়ে দেখ রাম রঘুমণি
আমায় বধিয়া গেল তোমার ঘরণি'
দেশে রইল মাতারে ভাই দেশে রইল পিতা
বিধির বিযোগ্য বামে চুরি হল সীতা।"

যে চিত্র দেখিয়ে এই গান গাওয়া হল, এবারে তার বিবরণ দেওয়া যাক—পিছনে গাছ, সামনে শ্রীরাম বসে আছেন ও শ্রীলক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে আছেন। উভয়ের হাতে বরাভয় চিহ্ন। তাদের সামনে নতজানু হয়ে রক্তাক্ত জটায়ু।

এই গান ও চিত্র দুটি পরস্পর মিলিয়ে দেখলে বলতেই হবে—যে দুটির বিষয়বস্তু হুবহু এক নয়। আধুনিক কালে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বীরভূমের পাকুড়হাঁস গ্রামে পট সন্ধানে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, যে এরা যা বলে তা আঁকে না এবং যা আঁকে তা বলে না। তাঁর 'দেখা হয় নাই' গ্রন্থে এর বিশদ বিবরণ আছে।

সারা বছরই পুলিন পট আঁকে। একটা পট আঁকতে—অর্থাৎ প্ল্যান করার সময়টুকু ধরে নিলে মাস দেড়-দুই সময় লেগে যায়।

পটের গান নিজেরাই তৈরী করে। এর কোন লিখিত রূপ নেই। বাপ থেকে ছেলে—তার থেকে নাতি—বংশপরম্পরায় এইভাবেই চলে আসছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই আজ পটের গানও তেমন শোনা যায় না। কারণ পট শিল্পচর্চাই যদি লুপ্ত হয়ে যায়, তবে পটুয়া গানও যে অদৃশ্য হয়ে যাবে—এ তো বলা বাহুল্য মাত্র!

পুলিনের বাবাও এই কাজ করত—ওর ছেলে অবশ্য প্রাইমারী স্কুলে পড়ে। আঁকতে শিখেছে অল্প অল্প। কিন্তু ছেলেকে এ লাইনে আনতে চায় না বাবা কি হবে এ' সব করে—পয়সা নেই একদম।

এই অস্থির টাল মাটাল দিনে কে এই সব শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করবে। ছু' একঘর যারা আছে—তারাই বা পাশে থাকবে কদ্দিন।

জমি-জমা আছে সামান্যই। শুধু পট এঁকে তো দিন চলে না। শেষ কথা বলেছিল পুলিন চিত্রকর—সে নিজের শিশুপুত্রকে এ লাইনে আনতে চায় না, কিন্তু নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছে আর এক পটিদারের সঙ্গে।

'দেখুন না, এখানে কেউ দু'চারটা যদি কেনে।' শুনে আমি বলেছিলাম: 'কলকাতা বড় হুজুগে জায়গা। এখানে এসব কেনবার লোক আছে যথেষ্ট। তবে যোগাযোগ হওয়া চাই। ঠিক আছে, নিয়ে যাই তোমার ঠিকানা, পরে যোগাযোগ করব।'

তখন পটের পিছনে পুলিনের প্রাইমারী স্কুলে পড়া শিশু পুত্র তার বাপের নাম লিখে দিল। পুলিনও লিখতে জানে।

পুলিন পটুয়ার সঙ্গে ঐ স্বল্প পরিসরে আমি শেষ যে কথাটা বলেছিলাম, তা একবার স্মরণ করুন, 'কলকাতা হল হুজুগের জায়গা।'

দুই

সুতরাং চলুন হুজুগের জায়গা ছেড়ে পটুয়াদের পাড়ায়। সেই মেদিনীপুরেই —তবে এবার আর রেল লাইনের ধার-পাশের কোন গ্রাম নয়—মেচেদা থেকে তমলুক এসে তারপর অন্য ঠিকানায়।

অজিত পটিদারের ঠিকানা পেয়েছিলাম তমলুক শহরের নৃতত্ত্বের গবেষক ডঃ তারাশিষ মুখোপাধ্যায়ের মুখে। অবশ্যি অজিত পটিদারের নামটি আমাকে

তার আগে জানিয়েছিলেন একজন—লোক সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক তারাপদ সাঁতরা মহাশয়।

তমলুক শহরের বাসস্ট্যাণ্ড থেকে ট্যাংরাখালি ও পুরুষাঘাটগামী বাস ধরুন—দূরত্ব মাত্র চৌদ্দ কিলোমিটার। বাসে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না। তারপর ঠেকুয়াচকের বাজার মোড়—সেখান থেকে সামান্য একটুখানি পথ গ্রামের মধ্যে ঢুকলেই খোদ পটুয়াদের আস্তানা।

ওখানেই আলাপ হল আশু, অজিত, বাবলুদের সঙ্গে। এদের মধ্যে বাবলু বয়সে হল নবীন—তার মুসলমান নাম হল বাহারউদ্দিন। অন্যদের মুসলমান নাম নেই। এদের প্রধান হল অজিত ওস্তাদ—তার ভাই বিষ্ণুপদও এখন পটিদার হয়েছে।

এদের নামের প্রচলিত পদবী কি তা জানা গেল না। তবে সাধারণ্যে এদের পরিচিতি পটিদার নামে। যারা চিন্তা-ভাবনায় একেবারেই গ্রাম্য তারা নিজেদের বলে মিস্ত্রি। কিন্তু যারা একটু শহুরে হয়েছে, সাধুভাষার মর্ম জেনেছে, তারা নিজেদের নামের সঙ্গে চিত্রকর শব্দ যুক্ত করে।

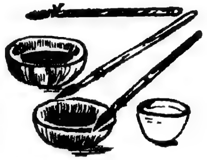

এদের বিচিত্র ধর্ম-চেতনা সম্বন্ধে আগেও যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এখনও তাই হল। তাই পট বেচতে চাইলে বা পটের গান শুনতে চাইলে সত্যপীর দিয়ে শুরু করে। তারপর দেখায় রামায়ণের কাহিনীভিত্তিক পট।

মহাভারতের কাহিনী এই পটুয়ারা তত পছন্দ করে না। তবে শ্রীকৃষ্ণ যে মহাভারতেরই তা এদের জানা নেই। নচেৎ ঘরে-বাইরে গাঁয়ে-গঞ্জে কৃষ্ণলীলা পটের এত জনপ্রিয়তা কেন?

অজিত মিস্ত্রি আরও জানালেন এসব ট্রাডিশনাল পটে এখন আর লোকের তত মন ধরে না। তবে যেহেতু পটশিল্প বরাবরই গড়ে উঠেছে দেব-দেবী কাহিনীর পরিমণ্ডলে, তাই নবযুগের নতুন ধারায় এখন এসেছে জীবনীমূলক পট অর্থাৎ শহুরে ভাষায় মহামানবের জীবনী।

তাহলে কি করে ধর্ম রক্ষা হয়?

আমার এ প্রশ্নে অজিত মিস্ত্রির বক্তব্য হল, প্রথমে যথারীতি দেব-বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। তারপর ধরা যাক বিদ্যাসাগরের জীবনী। এই পুণ্য জীবনী?

বর্ণনার শেষাংশে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল বিষ্ণুলোকে—তারপরই স্বর্গ মাহাত্ম্য ও বিষ্ণুনাম। এ ভাবেই ধর্মরক্ষা হল আবার পয়সার সংস্থানও হল।

মাটির উঠানে খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসে আমরা ঐসব কথা বলছিলাম। ওদের বাড়ীর স্ত্রীলোক ও বাচ্চারা হাঁ করে আমাদের দেখছিল—এসব দেখতে ওরা অভ্যস্ত। অনেক লোকজনই নাকি আসে এ গ্রামে।

একটি দশ বারো বছরের বালকও দেখলাম কচি হাতে পট আঁকা অভ্যাস করছে। কথায় কথায় আবার জানালো অজিত, পুরনো দিনের বিষয়বস্তু ছেড়ে দিয়ে এখন ওরা একটা নতুন কোন কিছুর দিকে ঝুঁকছে। শুধু বাঙ্গালী পাড়াতে গেলেই হয় না, বাংলাভাষী অন্যান্য সমাজেও যাতায়াত করতে হয়—নেহাৎই অর্থের জন্য। তাই এখন তারা সাঁওতাল জাতির জন্মকাহিনী নিয়ে পট আঁকে। সেটা নিয়ে গেয়ে আসে সাঁওতালদের পাড়ায়।

হয়তো কোন একদিন কেউ গেছিল ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে, সেই-ই সংগ্রহ করে এনেছে এই গল্প—এটা অজিতের অনুমান।

কিন্তু সাঁওতালী পট তারা গেয়ে শোনায়, তবে ব্যাখ্যা করে দেয় বাংলা গদ্যে। তারা যে সাঁওতালী ভাষা বোঝে এমন নয়। বেশ দক্ষতার সঙ্গে ওটা মুখস্থ করে নিয়েই বলে।

অজিতের হাতের কাজের কিছু বর্ণনা দেয়া যাক। এর হাতের সাঁওতালি পটটি বেশ নতুন ধরনের বলে মনে হল।

মাত্র চোদ্দটি ফ্রেমে সাঁওতালদের জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে আছে ফিকে সবুজ রং এবং গৃহের অভ্যন্তর ও জল ইত্যাদির ইঙ্গিত দিচ্ছে নীল পটভূমি। এছাড়া দেবতা, গরু এদের রং কালো—অবশ্য সাদা হলুদ রংএর গরুও আছে। এছাড়া পাখী, কুমীর, কচ্ছপ সব হলুদ রংএর। স্ত্রীলোক হল হলুদ এবং পুরুষ ব্রাউন।

প্রথম চিত্রটি হল দেব-বন্দনা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চিত্রে আছে মানুষ অর্থাৎ সাঁওতাল সৃষ্টির আগে পৃথিবীর অন্যান্য মানবেতর প্রাণী—পাখী, কুমীর, সাপ, কচ্ছপ, গরু ইত্যাদি। তার পরবর্তী চিত্র হতে শুরু হল প্রথম মানুষের জন্ম। তাদের শিকারে যাওয়া, সুন্দরী মেয়ের সন্ধান, সাত ছেলে ও সাত মেয়ের বিবাহ। তাদের বিয়ের বাদ্য, শিকার, সংসার যাত্রা ইত্যাদি—এইভাবে গল্প

এগিয়ে গেছে প্রায় রূপকথার ধরনে। বিষয়বস্তু প্রচুর, কিন্তু মাত্র চৌদ্দটা ছবিতে সব কাহিনীটা ধরিয়ে দিয়েছে।

একটা অবাক জিনিষ লক্ষ্য করলাম। একই বিষয় নিয়ে তিনটি জড়ান পট আমাকে দেখাল ওরা তিনজন—অজিত, তার ভাই বিষ্ণুপদ ও অজিতের বৌ। বিষয় 'সেতুবন্ধ' হলে কি হবে, উপস্থাপনে কত পার্থক্য। তিনজন শিল্পী একই সঙ্গে থাকে, একই বিষয় নিযে আঁকে এবং একই উপকরণ ও পদ্ধতিতে। তবু এদের তিন জনার শিল্প-ভাবনার কত পার্থক্য।

এইসব কথায় কথায় বেলা বাড়ছিল। আমাদের অন্য জায়গায় যাবার পরিকল্পনা ছিল, আকারে ইঙ্গিতে সে কথা বলেওছি ওদের। প্রত্যুত্তরে ওরা আমাদের দুপুরে এখানে খেতে অনুরোধ জানাল।

আমরা আমাদের অক্ষমতা জানাতে, অন্য একটা বিষয়ে কিছুটা জেনে নেওয়া গেল। এবারে এগিয়ে এল অজিতের ভাই বিষ্ণুপদ, পটুয়া গানেব সম্বন্ধে সে আমাদের কিছু জানালো।

যেটুকু জানা ছিল, তার সঙ্গে যা সংযুক্ত হল তা হল এই: ছবির সংখ্যা যদি কম হয়, তবে দীর্ঘ গানটাই গেয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে গানের বহু অংশ চিত্র শূন্য হয়ে পড়ে। আবার গান যদি ছবির তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন হয়, তবে দক্ষ গাইয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিভায় বাকীটুকু বানিয়ে বানিয়ে গেয়ে দেয়—নচেৎ ওদের এই সব গান সবারই মুখস্থ থাকে। এ কাজে অবশ্য অজিতের থেকে ওর ভাই বেশী পটু এবং তার প্রমাণও পাওয়া গেল।

আমাদের অনুরোধে 'সেতুবন্ধ' পটের গানটা সে মুখে মুখে গেয়ে গেল—ছবি সামনে রাখা ছিল। ছবি না থাকলে তারা গাইতেই পারে না।

গুণে দেখলাম শেষ পর্যন্ত ৭৪ লাইন হলো। মূল কাহিনী হল প্রথম ৭০ লাইন, তারপর সে গাইল:

'রথ লয়ে রাবণ রাজা করিয়া গমন
কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচে গীত রামায়ণ।'

এই পর্যন্ত শুনেই তাদের বললাম যে, তারা যে গান গাইল তা মূল রামায়ণে নেই এবং তা কৃত্তিবাসের লেখাও নয়। লেখা হল ঐ গায়কের অর্থাৎ বিষ্ণুপদর।

শুনে তো তারা দু'ভাই ভীষণ অবাক। এতদিন ধরে তারা এভাবেই রামায়ণ গেয়ে আসছে পট দেখিয়ে দেখিয়ে।

'ভণিতা' নামক শব্দটা তাদের জানা ছিল না। সেটা বুঝিয়ে বলতেই তখন একটু ভেবে নিয়ে বিষ্ণুপদ নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে শেষ দু'লাইন নতুন করে তৈরী করল :

'এখানে শেষ করলাম রামায়ণ বন্দনা।
শিল্পী বিষ্ণুপদ চিত্রকর ঠেকুয়াচক ঠিকানা।'

ইতিমধ্যে দুটি পদ পছন্দ করতে হল—এত গল্প-গুজব করে তো আর শুধু হাতে ওঠা যায় না। একটি সেতুবন্ধ পট ও অপরটি সাঁওতালী পট—অর্থাৎ দু'ধারার দুটি। প্রথমটি ঐতিহ্যশ্রয়ী ও দ্বিতীয়টি নবযুগের প্রয়োজনে রচিত।

আমার সহযাত্রী প্রশ্ন করলেন মুসলমানী পট সম্বন্ধে—অবশ্য প্রশ্নটা আমার মনেও জেগেছিল তখন। হিন্দু ধর্ম তো হল, কিন্তু যেটা ওদের নিজেদের ধর্ম—তার কথাও তাহলে হোক কিছু।

ব্যাপারটা ওদের মাথায় আসেনি আগে। তবে লায়লা মজনু, শিরি-ফরহাদ, সোরাব-রুস্তম জাতীয় ধ্রুপদী গল্পের পট তৈরী করতে পারলেও, ওরা বোধহয় ততটা সাহসী হয় না এ ব্যাপারে। ওদের ধারণা, সম্ভবতঃ এগুলি মুসলমান সমাজে অপসংস্কৃতি বলে গণ্য হবে।

এসব কথা অজিত বিষ্ণুপদের নয়, এগুলি আমাদের চিন্তার সারাংশ। মুসলমান সমাজে লোকধর্ম বলে কোন মতবাদ নেই। কোরানের কোন অংশ পটের মাধ্যমে চিত্রায়ণ—একথা কেউ ভাবতেই পারে না।

তবে উপরোক্ত কাহিনীগুলি কোরাণের নয় বা ধর্মীয় নয়। তাই সেগুলি পটে রূপান্তরিত করা তত বিপজ্জনক নয়। কিন্তু তাতেও ওদের সন্দেহ—লোকে কিনবে তো ?

এই ভাবেই চলে অজিত-বিষ্ণুপদর জীবন। এখন এরা শুধু জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামেই যায় না। শহরেও যেতে শুরু করেছে। কলকাতায় কিছুদিন আগেও বাস-এর দোতালায় অন্যান্য হকারদের মতই পট বিক্রী করত—গান গেয়ে ছবি দেখিয়ে।

এদের বেশ কিছু পট কিনেছেন শান্তিনিকেতনের কলা ভবন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির অধ্যাপক তুষার চট্টোপাধ্যায়। বালিগঞ্জের বিশিষ্ট নাগরিক পি. লাল, লোক-সংস্কৃতির গবেষক তারাপদ সাঁতরা —সেই সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কর্তৃপক্ষ তো আছেনই। এদেশের

লোকে কি-ই বা দাম দেয় পটের। ওদের কাছ থেকেই জানা গেল ইদানীং কালের পট বিক্রীর হাল-চাল।

রংয়ের ব্যবহার, কাগজের গুণাগুণ এবং আয়তন এই তিনটির কম-বেশী বা ওঠা নামার জন্য দামের তারতম্য হয়।

সাধারণতঃ বিদেশীরা এ ব্যাপারে বেশী টাকা খরচ করেন বলে সেগুলি খুব ভাল কাগজের রং ঝলমলে করে আঁকা হয়। সেগুলি এক একটার দাম কখনো কখনো আড়াইশ' পর্যন্ত হয়। তবে কম দামে বিক্রী হবার জন্য এরা এখন অতি সাধারণ দিস্তে কাগজেই পট আঁকছেন।

কতদিনই বা এসব এঁকে দিন চলবে—দু' ভায়েরই এই একই কথা। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ে বাড়ীর মেয়েরা।

মৃৎ শিল্প আর তাঁতশিল্পের দিকে ঝুঁকছে ধীরে ধীরে। পোটো পাড়া 'অবশ্য এ' গ্রামেই আছে—ঢোকবার সময়েই তা নজরে এসেছিল। এরাও করে—তার কিছু কিছু নমুনাও দেখালো। আগে মৃৎশিল্প-তাঁতশিল্প ছিল অবসর সময়ের কাজ, এখন এটাই হয়েছে প্রধান। আর পট আঁকা হয় সময় পেলে বা কেউ অর্ডার দিয়ে গেলে।

তবু শুনে ভাল লাগল যে, এখনও এরা দেশীয় প্রথায় রং তৈরী করে ছবি আঁকে। সে পদ্ধতিও বড় বিচিত্র।

সিম গাছ থেকে আসে সবুজ রং। হলুদ বের হয় হরতেল থেকে। সিঁদুর হয় লাল রং। ভুষো কালি থেকে হয় ঘন কালো। আর কাপড়ে দেবার নীল রং থেকে নীল রং। তবে দু' তিনটি রং মিলিয়ে নতুন নতুন নতুন রং তৈরী করতেও এরা ওস্তাদ।

একটা নারকেলের মালায় কালো রং তৈরীই ছিল। একটা ছেলে তাই দিয়ে পট আঁকার শিক্ষানবিশী করছিল। আমি অজিতকে বললাম, তার নাম ঠিকানা পটের পিছনে লিখে দিতে—যত্ন করে কালো রং-এ লিখে দিল নিজের নাম ঠিকানা। বেশ আর্টিষ্টিক ওর অক্ষরের ছাঁদ।

ভাল করে চেয়ে দেখলাম, ওর তুলিটি যেন কেমন অচেনা বস্তুর তৈরী। পরে জানতে পেরেছি তা হল ছাগলের পিঠের লোম দিয়ে তৈরী। নিজেই করে নিয়েছে। তুলির যা দাম—কোথা থেকে কিনবে!

অজিত যতক্ষণ পটের পিছনে নিজের নাম ঠিকানা লিখছিল তখন বিষ্ণুপদ

কোথায় যেন উঠে গেছিল। লেখা শেষ হতেই ফিরে এল আমাদের সামনে—হাতে একটা ছাপানো কাগজ, অনেকটা হ্যাণ্ডবিল গোছের।

অজিতের সলজ্জ চাহনি দেখে বুঝলাম, এর সঙ্গে ও নিশ্চয় কোন ভাবে জড়িত বিষ্ণুপদ জানালো, একদা এখানে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পদার্পণ করেছিলেন। তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছিল এই পটুয়ারা। তাদের মুখপত্র হযে অজিত রচনা করেছিল এই কবিতা—তারপর ছাপিয়েছে

আশ্চয হয়ে গেলাম আমরা। ও যে শুধু মুখে মুখে গান তৈরী করে গাইতে পারে—তা নয়, কাব্য প্রতিভাও আছে! দু একটি বানান ভুল ছাড়া, মোটামুটি সাহিত্য গুণ সম্পন্ন :

স্বস্বাগতম বঙ্গ দুলাল শান্তির কর্ণধার।
চালাও চক্র কাটুক ত্রিতাপ দুঃখের পরিহাস ॥
দুঃখেরে তুমি ডরিও না, সাধনায তব সত্য
দুঃখ যদি হয় কণ্ঠের হার এইত তব চিত্ত ॥

এর পর আছে অনেক ভালো ভালো কথা যেগুলি বিদ্যাসাগর, রামমোহন রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি মহাপুরুষ সম্বন্ধে চিরকাল যা বলা হয়ে থাকে প্রায় সেই জাতের। কবিতার শেষাংশে কবির ভণিতা হল :

অভিনন্দন লিখছি আমি ক্ষমার যোগ্য বারংবার ॥
শিল্পী শ্রী মিস্ত্রী অজিত বাস্তুহারা চিত্রকার।
ঠেকুয়াচক বাসভূমি মোর পোষ্ট কুম ঠিকানা।
ডিষ্ট মিডনাপুর সাব তমলুক মহিষাদল থানা ॥

একে একে পটগুলো জড়িয়ে নিয়ে, দুটো যাদুপট উপহার নিয়ে, সেই সঙ্গে উপরের ছাপা কাগজের কবিতাটা নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোলাম।

একদিনের পক্ষে অনেক কাজ হল।

জানি না আর কোন দিন অজিত মিস্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে কিনা। হয়তো কোনদিন কলকাতার রাস্তায় বা ডবল ডেকার বাসে বা রাণী ভিক্টোরিয়ার বাগানে দেখা হবে হঠাৎ।

তিন

সহসাই মনে পড়ে গেল বিমল চিত্রকরের কথা। তার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ আলাপ হয়নি। কেননা, যেদিন আমি গেছিলাম আখড়াপুঞ্জিতে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য, সেদিন সে আমারই সামনে সাইকেল করে বেরিয়ে গেছিল। তার হাতে ঘড়ি বাঁধা ছিল, এ কথা মনে আছে।

পরে তার সন্ধান পেয়েছিল সজলকান্তি—নাটকের সন্ধানে সে যাত্রা করেছিল আখড়াপুঞ্জির পটুয়া পল্লীতে। কিছু নাটক সে নাকি পেয়েওছিল ওদের কাছ থেকে—ওদের জীবনের নাটক। তারপর লিখেছিল সে নাটক। ছেলেদের দিয়ে মহাসমারোহে অভিনয়ও করিয়েছিল—পটুয়াদের জীবন নিয়ে লেখা এটাই বোধহয় প্রথম নাটক। যাক সে সব কথা।

সজলকান্তির নাটক সন্ধান আর আমার পটুয়া সন্ধান—অভিজ্ঞতা কিন্তু হয়েছিল একই।

কলকাতার অতি কাছ-ঘেঁষা এই পোটোপাড়াতে এখন পটুয়াদের বৌ-রা দুপুরে খোলা উঠানে মাদুর পেতে বুকে উপুড় হয়ে শুয়ে গান শোনে। আরামের জন্য পা দুটি ভাঁজ করে উপরে তুলে দেয়। সিন্থেটিক ফাইবারের শাড়ি সরে যায় পা থেকে, সেদিকে লক্ষ্য থাকে না। বিমল চিত্রকরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের চেয়ে, এই অভিজ্ঞতাটাও কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বাইরের লোক হঠাৎ এসে গেলে, ওরা আজ এ জন্য চঞ্চল হয় না। শুধু ট্রাঞ্জিষ্টারটা বন্ধ করে, আগত ব্যক্তির কথাটা শুনে—'বাড়ী নেই' বলে আবার ট্রাঞ্জিষ্টারে 'ফুলকলি রে ফুলকলি'-তে মন বসায়।

এ পাড়ার যারা পটিদার অর্থাৎ চিত্রকরের কাজ করত, তারা সব এখন প্রতিমা গড়া ধরেছে।

নিছক পড়াশোনার জন্য গেছি শুনে কেউই সামনে এসে কথা বলতে চায়নি। তবে কাগজের লোকেরা এলে তাদের সামনে বসিয়ে 'ইণ্টারভিউ' দিয়েছে—ইতিপূর্বে সে কথাটা তারা জানিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে টেপ ছিল না, ছিল না ক্যামেরা। ছিল শুধু আগ্রহ আর আন্তরিকতা।

তাই বিমল চিত্রকরের বাড়ীর লোকজন বলল—আগে থেকে বলে-কয়ে এলে দেখা হতে পারে তার সঙ্গে। সে খুব ব্যস্ত মানুষ। মনে নেই, তারা এ প্রসঙ্গে 'অ্যাপয়েন্টমেণ্ট' শব্দটা ব্যবহার করেছিল কি না।

কিন্তু সজলকান্তিদের সঙ্গে টেপ নামক টোপ ছিল, ছিল আনুষঙ্গিক। তাই মাত্র ঘণ্টাখানেকেব চেষ্টায তারা যে জীবন নাটক সংগ্রহ কবেছিল ঐ পটুয়া পল্লী থেকে, তা' আমাব অভিজ্ঞতারই সম্প্রসারিত রূপ মাত্র।

ওদের মেযেরা এখন পটেব গান গায। ভঙ্গীটা থাকে রেকর্ডের গাযিকার গলার অনুকবণ। টেপ না চালালে সহজে কথাবার্তাই বলতে চায না—গান তো দূরের কথা। উচ্চারণে বিশুদ্ধ গ্রাম্যতা খুঁজে পাওযা যাবে না। পুরুষেরা তো এ'সব ব্যাপার নিযে মাথাই ঘামায না। পরিবর্তে তারা কি করে সে তো আগেই বলা হযেছে।

ওরা নিজেদের সম্বন্ধে—অর্থাৎ এ যাবৎকাল বিভিন্ন সন্ধানী গবেষক যা বলেছেন—সে সব কথাই বলে ঘুরিযে ফিবিযে। সামাজিক-আর্থিক পরিস্থিতি কোথায গিযে দাঁডিযেছে—তাও বিশ্লেষণেব চেষ্টা কবি। তবে পটের কাজ আর এখন কেউ করে না। জডানো পট তো নযই।

বিক্রী হয কিনা বা কি রকম দামে—সে সব কথার স্পষ্ট উত্তর পাওযা যায় না। তবে নিতান্ত আগ্রহী ব্যক্তি যথোচিত সমাদরে তাদের 'ইণ্টারভিউ' নিলে, দু'চারটে পট উপহাব দিতেও পারে—যেমন পেয়েছিল সজলকান্তিরা।

লক্ষ্য করে দেখেছি, সে ছবি হল একদা কালীঘাটের পটুয়াদের আঁকা বিখ্যাত ছবিগুলির অনুকবণ মাত্র। সন্দেহ হল হযতো ভুষোকালি নয, চাইনিজ ইংকে আঁকা। রঙীন পটগুলো চোখে পড়েনি। ভয হচ্ছিল, হযতো সেখানে দেখব পোস্টাব কালারের ব্যবহার।

আশ্চর্য সব পটুয়াদেব জীবন-বৃত্তান্ত। পুলিন চিত্রকরকে দেখলাম রাণী ভিক্টোরিযার স্মৃতি সৌধে। অজিত পটিদারকে তার গ্রাম্য পরিবেশে আব বিমল চিত্রকরকে তার আধা গ্রাম্য পরিবেশে। একজন অভাবের তাড়নায ঘর ছেড়ে শহরের পথে নেমেছে। আর একজন পথে নামব নামব ভাবছে। একজন শহুরে হযে গেছে বলে পট চর্চাই ছেডে দিযেছে বলতে গেলে। এরা কেউ মেদিনীপুর বা কেউ চব্বিশ পরগণার বাসিন্দা হতে পারে—তবে চরিত্রে সব এক। সামাজিক-আর্থিক কাঠামোর নাড়াচাড়ায ধীরে ধীরে এদের শিল্প-নৈপুণ্য যাদুঘরের ও গবেষকদের বিষয়বস্তু হযে উঠছে—এটাই হল সত্য কথা।

পটচিত্র, চলচ্চিত্র ও কমিকস্

বাংলার লোকচিত্রকলার ক্ষেত্রে পট চিত্র বিষয়টি এখনও বেশ বিতর্কিত হয়ে আছে। উপস্থাপন বৈচিত্র্য, অংকন নৈপুণ্য ইত্যাদি নিয়ে তার সামগ্রিক রূপটি শুধু যে বঙ্গীয় শিল্প সমালোচকদের কাছেই বিতর্কের বস্তু এমন নয়, ভারতের ও বিদেশের কলারসিক মহলেও তার আলোচনা হয়েছে একাধিকবার।

এ বিষয়ে কালিঘাটের চৌকা পটের কথা পাদপ্রদীপের আলোয় এলেও, জড়ানো পটগুলিও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। একক পটে বিষয় বস্তু মাত্র একটিই। তাতে শিল্পীর বিষয় নির্বাচন, দক্ষতা, অংকন-প্রতিভা, উপস্থাপন নৈপুণ্য ইত্যাদি সবই কেন্দ্রীভূত হয় একটি চিত্রের জন্য।

কিন্তু জড়ানো পটে শিল্পীকে উপরোক্ত সমস্ত গুণই সঞ্চারিত করতে হয়, প্রতিটি চিত্রের বা ফ্রেমের জন্য। এ কাজ অতি গুরুত্বপূর্ণ। কোন শিল্পীর পক্ষেই একই কাহিনীভুক্ত প্রতিটি চিত্রের জন্য সমানভাবে নাটকীয়তা, চিত্র-ধর্মীতা ও সর্বোপরি রস সঞ্চার করে যাওয়া বিশেষ প্রতিভা সাপেক্ষ। অন্যথায় গল্পটি ঝুলে যাবে অর্থাৎ পট চিত্রণের বা দেখানোর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। যেহেতু জড়ানো পটে ফ্রেমের সংখ্যা অধিক, তাই এই বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ অতীব প্রয়োজনীয়।

কালীঘাটের চৌকো পটের সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য হল যে, দীর্ঘ পটটি লাটাইয়ের মত জড়িয়ে রাখা হয় বা দেখানোর পর লাটাইয়ের মত গুটিয়ে নিতে হয়। সম্ভবতঃ সেই জন্যই আধুনিক লোকচিত্র গবেষক একে লাটাই পট বলতে চান। জড়ান পট শব্দটি এত উদার যে তাকে বিশেষিত করতে পূর্বোক্ত শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।[১]

চিত্রাংকনের বা চিত্র-বস্তু রূপায়ণের প্যানেল-ধর্মীতা বা ধারাবাহিকতাকে উদার দৃষ্টিতে বিচার করলে, সুপ্রাচীন কাল থেকে লোকশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে তাকে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। মন্দির গাত্রের টেরাকোটা থেকে সুরু করে মন্দির-স্তম্ভ পর্যন্ত এই রীতির মাধ্যমে রূপায়ণের উদাহরণ হতে পারে।

রামায়ণে বর্ণিত চিত্র-সজ্জিত কক্ষের সঙ্গে জড়ানো পটের অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে সেগুলি উপর থেকে নীচে না খুলে আড়াআড়িভাবে এপাশ থেকে ওপাশ অবধি জড়ানো হত। সম্ভবতঃ এই রীতিতেই ভরহুত এবং সাঁচীর বিখ্যাত তোরণের ওপরকার নানা চিত্র খোদিত হয়েছিল—প্রকৃতপক্ষে এগুলি ছিল পাথরের কড়ি বিশেষ। দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রে যে ধারাবাহিক কাহিনী ক্রমপর্যায়ে উপস্থিত করা হয়, তা-ও কি জড়ান পটের সমতুল্য নয়? পূর্বোক্ত তোরণগুলির স্তম্ভে উপর থেকে নীচের দিকে বিভিন্ন ধারাবাহিক দৃশ্য খোদাই করা হয়েছে। তোরণের কড়ি ও স্তম্ভের সঙ্গে তফাৎ সামান্যই—একটিতে যা করা হয়েছে আড়াআড়ি, আরেকটিতে তা করা হয়েছে লম্বালম্বি। তবে আড়াআড়ি ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃশ্য পর পর একটানা রচনা করা হয়েছে, এবং লম্বালম্বি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট খোপের মধ্যে তা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত হয়েছে। বর্ণনার এই ভঙ্গীতে পটচিত্রের প্রভাব থাক বা না থাক, ধারাবাহিক চিত্রের মাধ্যমে বক্তব্য বিষয় উপস্থাপন যে অতি প্রাচীনকালের এবং তা ভিন্ন ভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত—এ' সত্য প্রকাশ পায়।[২]

সুতরাং প্যানেলধর্মী চিত্র বলতে যে উদার অর্থে ধারাবাহিকভাবে অংকিত দৃশ্যাবলী বোঝান হয়েছে—এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। এই ধারাবাহিকতাকে কে কিভাবে রক্ষা করেছেন—সেটাই হল বিবেচ্য। বিশেষতঃ জীবনীমূলক চিত্র রচনার ক্ষেত্রে তো বটেই।[৩]

বঙ্গদেশের পট-শিল্পের ক্ষেত্রে প্যানেল-ধর্মী চিত্রাংকনের ব্যাপারে স্বভাবতই জড়ানো পটের (Scroll) কথাটি মনে আসতে পারে। এই পটগুলিতে চিত্রসংখ্যা হয় ১০।১৫ থেকে ২৮।৩০ পর্যন্ত—কাহিনীর দৈর্ঘ অনুযায়ী তা স্থির করা হয়।

কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না। এই সঙ্গে চিত্রকরের বিষয় বিভাজন রীতি, বিষয় নির্বাচন নীতি, দৃশ্যের চিত্রায়ণ দক্ষতা ইত্যাদি গুলিও যোগ করতে হবে। এ বিষয়টি একটু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

একটি বিশাল গল্পকে চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করতে হলে, তার মধ্যে অনেক কিছুই বর্জন করতে হয় এবং যথার্থ চুম্বক বা ইঙ্গিত-মূলক ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে মূল কাহিনীটি সজ্জিত বা চিত্রায়িত করা হয়। অর্থাৎ যে নিয়মে নবকৃষ্ণ-উপেন্দ্রনাথ-যোগীন্দ্রনাথরা মূল রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর সারসংক্ষেপ করে ছোটদের কাছে তুলে ধরতেন। রাজশেখর বসুর সংক্ষিপ্ত রামায়ণ-মহাভারত এ জাতীয় আর একটি উদাহরণ।

এ বিষয়ে লাটাই বা জড়ান পটের শিল্পীরা যে দক্ষতা অর্জন করেছেন— স্বীকার করতেই হবে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারতের গল্প ইত্যাদি প্রচলিত কাহিনীগুলি চিত্রায়ণের সময়ে তারা অত্যন্ত দক্ষভাবে মূল কাহিনীর অপ্রয়োজনীয় অংশকে বর্জন করে, খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তার চিত্ররূপ দিয়েছেন ধারাবাহিকভাবে। এ বিষয়ে তাদের দক্ষতা কোন অংশেই নবকৃষ্ণ-উপেন্দ্রনাথ-যোগীন্দ্রনাথ ইত্যাদির চেয়ে কম নয়।

অপ্রযোজনীয় বোধে তারা যেগুলি বর্জন করেছেন—সেগুলি প্রকৃতপক্ষে বর্জন নয়—তাদের ধারাভাষ্য দিযে সে কাহিনী বর্ণিত হযেছে। পটচিত্রের ক্ষেত্রে এই ধারা ভাষ্য হল, সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি করা কবিতা—যার প্রচলিত পণ্ডিতী নাম পটুয়া সঙ্গীত।

পটুয়া সঙ্গীত—যাকে জডানো পটের ধারাভাষ্য বলা হয়েছে, সেটা না থাকলে পট দেখানোর কোন অর্থই হয না। অন্যপক্ষে ঐ ধারাভাষ্য-রূপ পটগীতের জন্যই পটদর্শন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পটচিত্র সংগ্রাহকরূপে এদেশে গুরুসদয় দত্তের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তিনি একই সঙ্গে পটগীতও সংগ্রহ করেছিলেন। দুটি কাজ যে একই সঙ্গে করা প্রয়োজন—তা' তিনি বুঝেছিলেন বলেই, কিছু মূল্যবান পটগীতি আজো বেঁচে আছে। পটুয়া, পট এবং পটগীত—এদের পরস্পরের সুগভীর আত্মীয়তা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হল :

'একাধারে ইহারা ভক্ত-সাধক, কবি-গায়ক ও চিত্রশিল্পী অর্থাৎ একদেশদর্শী শিল্পী নহেন ; আত্মার সুগভীর ভাবরসের ও ভক্তির, চিত্র শিল্পের, কাব্যের ও সুরের স্রষ্টা ও সাধকরূপ পূর্ণাঙ্গ শিল্পী।' ধারাভাষ্য-রূপে পটগীতির এই গুরুত্বের কথা এর চেয়ে সুস্পষ্টভাবে কেউ বলেন নি।[৪]

এইসব ভ্রাম্যমান গায়ক-চিত্রকরদের যে একটা সহজ কাব্যানুরাগ ছিল, একথা সকলেই বলেছেন। তাদের দো-তরফা ব্যবসা এবং ধর্ম ও শিল্প সম্বন্ধীয় ঐতিহ্যগত যে ভাবধারা তারা বহন করে এসেছে, তার মধ্যেই এর উৎস নিহিত আছে বলে মনে হয়। সেইজন্য অবলুপ্তির প্রান্তসীমায় এসেও তারা সেই কবিত্ব শক্তিকে একেবারে বিনষ্ট করতে পারেনি। তাদের কবি মনের নানা কল্পনা ও অনুভূতি চিত্রের মধ্য দিয়ে তারা প্রকাশ করতে পেরেছে। তাই যখন তারা কোন ঘটনা চিত্র ও গানের মাধ্যমে গ্রাম্য লোকের সামনে তুলে ধরত, সেইসব লোকের মনেও তখন অনুরূপ ভাব জেগে উঠত। উদাহরণ স্বরূপ, যে

ছবিতে রাম ও লক্ষ্মণকে সীতার শূন্য কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, তাতে দর্শকরাও ঐ দুটি বীরপুরুষের হৃদয়ের শূন্যতা বেশ অনুভব করতে পারেন। বাকীটুকু পূর্ণ করে দেয় পটুয়ার গান। [৪(ক)]

এ' বিষয়টি চলচ্চিত্রের ডকুমেণ্টারী বা প্রামাণিক চিত্রের ধারাভাষ্যের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। প্রামাণিক বা দলিল চিত্রকে নানাভাবে প্রামাণ্য করে তুলবার জন্য, যেটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম—তা' হল ধারাভাষ্য। এবং জড়ানো পটের ক্ষেত্রে তা হল ছবির সঙ্গে সঙ্গে পটের গান। পৃথিবীর কিছু কিছু ধ্রুপদী প্রামাণিক চিত্র—যা শুধু উপযুক্তগভীর ধারাভাষ্যের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে—তা হল ১৯৩৪-৩৫ সালে নির্মিত 'সঙ অব সিলোন', ১৯৩৩ সালে নির্মিত 'নাইট মেল'—দুটিই ব্রিটিশ উদ্যোগে নির্মিত। প্রয়োজন অনুযায়ী গদ্য ও পদ্যের ব্যবহার এই দুটি চিত্রকে বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে।[৫]

যে পদ্ধতিতে জড়ানো পটের শিল্পী বিষয় নির্বাচন, দৃশ্য নির্মাণ ও উপস্থাপন করেন—তার কোন লিখিত রূপ নেই। ওটা তারা স্বাভাবিক দক্ষতায় করে থাকেন। প্রথমে নিজের মনে মনে দীর্ঘ কাহিনীকে সাজিযে নেন। যেটুকু পারেন নির্দিষ্ট ছবিতে প্রকাশ করেন, বাকীটা তো রইলই—মুখের কথায় অর্থাৎ সঙ্গীতের মাধ্যমে তা' প্রকাশ করা যাবে। এই রীতিটি যে অবিকল চলচ্চিত্রের প্রামাণিক চিত্র নির্মাণের রীতি অনুযায়ী—সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। অথবা এও হতে পারে যে, শিল্পীরা এর জন্য মোটেই চিন্তা করেন না—তাঁরা বংশ পরম্পরায় উক্ত কাহিনীকে এ'ভাবেই উপস্থাপিত হতে দেখে এসেছেন। তাই সেই একই পদ্ধতিতে তারাও দৃশ্য বিভাজন, বিষয় নির্বাচন, কাহিনীর গ্রহণ-বর্জন ইত্যাদি ক্রিয়া করে যান।

তবে একথা ঠিক, বাণিজ্যিক প্রয়োজনে পটিদাররা একই কাহিনীকে কম সংখ্যক বা বেশী সংখ্যক চিত্রে বা দৃশ্যে গল্পটিকে সম্পূর্ণ করে দিতে পারেন; অর্থাৎ স্থূল ভাষায়—যে যেমন টাকা ঢালবে, তার জন্য সেইমত ছবির সংখ্যা বাড়া-কম হবে। মেদিনীপুরের পটুয়ারা সরাসরি এ'সব কথা বলে দেন।[৬]

দেবাশিসবাবুও বীরভূমের পটুয়া পল্লীতে গিয়ে অনুরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তিনি বলেছেন, কখনও বা প্রচলিত পটগানের ক্রমে নতুন পটচিত্র আঁকা হয়, ফলে চিত্রের তারতম্য হতেই পারে। তবে পট যদি কোন কারণে সংক্ষেপিত হয়, তখন গাইয়ে সেই অনুযায়ী তার গানের পরিমাণ কমিয়ে দেন; অর্থাৎ এর প্রচ্ছন্ন কারণ হল পয়সা অনুযায়ী দক্ষিণা।[৭]

সুতরাং দৃশ্যের বা কাহিনীর গ্রহণ-বর্জন নীতিই যে সব সময়ে শিল্প বা রসের নিয়মে হয় তা নয়, এর পিছনে থাকে একটি অর্থ নৈতিক কারণও। যে যত সময় নিয়ে তা' শুনবে, তার জন্য তা' তত দীর্ঘ হতে পারে।

চলচ্চিত্রের ডকুমেণ্টারী চিত্রের ক্ষেত্রে অবশ্য এমনটি হবার নয়। সেখানে অর্থ বা সময় কোন প্রশ্নই নয়। তাই পূর্বোক্ত ব্রিটিশ চিত্র দুটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে চল্লিশ ও পঁচিশ মিনিট এবং অপর একটি আমেরিকান তথ্যচিত্র 'দি রিভার'-এর (১৯৩৭) দৈর্ঘ্য একত্রিশ মিনিট। এর পরিপ্রেক্ষিতে একঘণ্টা ব্যাপী দীর্ঘ তথ্যচিত্রের উদাহরণও আছে। যেমন—এদেশে সত্যজিৎ রায়ের তথ্যচিত্র 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' বা ওদেশের ব্রিটিশ চিত্র 'ডেজার্ট ভিকটরী'।[৮]

পটুয়ারা কিভাবে পটচিত্রের বাড়া-কমার ব্যাপারটা আয়ত্ত করেছেন, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যায়। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অভিজ্ঞতা থেকেই উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পটুয়াদের পটগীতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

জড়ানো পটের একটি দৃশ্যে হয়তো দেখাচ্ছে একটি সাপ ফণা বিস্তার করে আছে। তার মাথার উপরে এক শিশু নৃত্যরত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছে। দু'পাশে দু'জন নাগকন্যা করজোড়ে শিশুর মুখের দিকে দেখছে। স্পষ্টতই এটা হল কৃষ্ণলীলার কালীয় দমনের একটি দৃশ্য। এই দৃশ্যটি দেখিয়ে পটুয়া গাইবে :

> কালীদহের কুলে ছিল কেলি-কদম্বের গাছ।
> তাতে চড়ে কৃষ্ণচন্দ্র দিয়েছিলেন ঝাঁপ॥
> কালীনাগ আজ আহার বলে সকলে ঘেরিল।
> নাগবতী দুইটি কন্যা উপস্থিত হইল॥
> নাগের মাথায় পদ দিয়ে,
> দেখুন, ঠাকুর নাচিতে লাগিল॥[৯]

অর্থাৎ চিত্রের বিষয়ের থেকে গানের বিষয় অনেক বেশী। চিত্রে যা নেই অথচ থাকা উচিত ছিল—আর্থিক বা অন্য কারণে তাকে তা বর্জন করতে হয়েছে। গানের দ্বারা পটুয়া সেই বর্জিত অংশটা সম্পূর্ণ করে দিল।

কিন্তু এটা যদি একালের কোন শিক্ষিত শহরে পাশ-করা আধুনিক পটচিত্র শিল্পীর হাতে পড়ত, তা হলে উপস্থাপনাটা হয়তো সম্পূর্ণ অন্য রকম দাঁড়াতো। অর্থাৎ, সেক্ষেত্রে সমগ্র কাহিনীকে নিয়ে একটা খসড়া রচনা করা হোত। তার

মধ্যেই উল্লেখ থাকবে, মূল কাহিনীর কোন কোন অংশ চিত্রায়িত হবে। কতটা ধারাভাষ্য বা পটুয়া সঙ্গীত কোথায় কোথায় গাইতে হবে—তার নির্দেশ ইত্যাদি। সোজা কথায়, থাকতো একটা প্ল্যানিং অর্থাৎ চিত্র নিযে নাট্য রচনার প্ল্যানিং।

এবং তখন হযতো উপরোক্ত দৃশ্যটিকে এইভাবে উপস্থাপন করা হোত—(১) দূর থেকে কালীদহের কূলে কেলি-কদম্বের গাছ, (২) কালীদহের কালো জল ও ঢেউ, (৩) কাছ থেকে কালীনাগের দৌরাত্ম্য, (৪) কদম্বের গাছ থেকে কৃষ্ণচন্দ্রের ঝাঁপ, (৫) দূর থেকে নাগের মাথায শিশুকৃষ্ণের অবস্থান, (৬) কাছ থেকে ঐ একই দৃশ্য, (৭) দু'পাশে দুই নাগ কন্যার আর্বিভাব, (৮) তারা কর-জোড়ে দাঁড়িযে আছে—ইত্যাদি।

এই বিভাজনটিকে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে তাতে নানা কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে। উপরোক্ত পরিকল্পনাটিকে যদি আধুনিক ভাষায় চিত্রনাট্য বলা হয়, তবে তা উক্ত জডানো পটের ক্ষেত্রে প্রযোগ করা বোধ হয় খুব অসঙ্গত হবে না।

যদিও চিত্রনাট্য শব্দটির অন্য একটি ইমেজ বর্তমানে আমাদের সামনে রয়েছে—কিন্তু মূলতঃ দুটিই বোধহয় এক। একটি কাহিনীকে চিত্রায়িত করতে হলে যে যে ক্রিয়া-কর্ম প্রয়োজন তাই যদি চিত্রনাট্য হয়, তবে চলচ্চিত্র শিল্পী যেভাবে তা করেন লিখিতভাবে ও অনেক কারিগরী কুশলতা প্রয়োগ করে, পটশিল্পী তা করেন অলিখিতভাবে ও অপেক্ষাকৃত কম কারিগরী কুশলতা প্রযোগ করে।

লক্ষণীয় যে, চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে শট্, সিকোয়েন্স ইত্যাদি বা ক্যামেরা স্থাপনের নিয়ম-কানুন—ইত্যাদিগুলি চলচ্চিত্র মাধ্যমের জন্যই প্রযোজ্য। যদি এর মাধ্যম ফিল্ম না হয়ে অন্য কিছু হত, তবে সে ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশগুলিও অন্যভাবে লেখা হত।

জড়ানো পটের বা প্যানেলধর্মী পটগুলির ক্ষেত্রে অনুরূপ একটি অদৃশ্য চিত্রনাট্য কি মনে মনে কল্পনা করে নেওযা যায় না—যেমন করে আমরা করেছি একটু আগেই? অবশ্যই এটা হাতে আঁকা, তাই তার সুযোগ অনেক কম। কিন্তু মনে রাখতে হবে, চলচ্চিত্র উদ্ভব হওয়ার আগে অনেক দিন আগে থেকে এই সব স্থির চিত্র দিয়েই

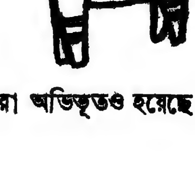

নাট্যরসসৃষ্টি করা হয়েছে দর্শকের সামনে এবং দর্শক তার-দ্বারা অভিভূতও হয়েছে।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পট দেখিয়ে চিত্ত বিনোদনের কথা বিভিন্ন স্থানেই উল্লিখিত হয়েছে। কালিদাসের রচিত নানা নাটকে এবং ভবভূতির 'উত্তররাম চরিত'-এ পট রচনা ও পট প্রদর্শনের উল্লেখ দেখা যায়। বিশাখদত্তের বিতর্কিত রাজনৈতিক নাটক 'মুদ্রারাক্ষস'-এ 'যমপট' শব্দের উল্লেখ আছে। উক্ত নাটকের রচনাকাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে যে জনসাধারণ 'যমপট' দেখে আনন্দ পেতো. সে কথা বেশ বোঝা যায়। আর বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত'-এ তো পট দেখানোর বিশদ বিবরণই আছে। পটুয়ারা সেই পট দেখিয়ে জনতাকে জীবনের অনিত্যতা, পিতা-মাতা-ভ্রাতা-বন্ধু সম্পর্কের অসারতা ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন করে দিতেন। বাণভট্টের ব্যক্তিগত জীবনে এই পট দেখার অভ্যাস না থাকলে তার এই বিবরণ এত জীবন্ত হয়ে উঠতো না।[১০]

অবশ্য চলচ্চিত্র ও তার দর্শক যে ধরনের, জড়ানো পট ও তার দর্শক সেই ধরনের। এক্ষেত্রে দর্শকের শিক্ষা, রুচি, সামাজিক চৈতন্য, সর্বোপরি পরিবেশ ইত্যাদির কথা এসে পড়বেই। কিন্তু তা হলেও উভয়ের মধ্যে যে প্রধান বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে, তা হল—জড়ানো পটের ক্ষেত্রে কাহিনীকে সংকুচিত করে কয়েকটি মাত্র দৃশ্যে নিয়ে আসা এবং চলচ্চিত্রে একটি বিবরণকে ভেঙে অসংখ্য চিত্রে সাজিয়ে নেওয়া।

তবে কারিগরী বিদ্যার উন্নতির সাথে সাথে যেমন চলচ্চিত্র গ্রহণের নানা কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে, পটশিল্পের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সেরকম কোন সম্ভাবনা দেখা যায়নি। কারণ এর মধ্যে কারিগরী ব্যাপারটা যা আছে—তা সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের।

এক্ষেত্রে 'কারিগরী' শব্দটা কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। একই স্থির বিষয় নিয়ে দু'জন চলচ্চিত্র শিল্পী চিত্রগ্রহণ করলে, তার মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য দেখা দেবেই। সেটা হতে পারে বিষয়টা ফ্রেমে ধরানোর ব্যাপারে, ক্যামেরা বসানোর ব্যাপারে—কিংবা কাহিনী দৃশ্যানুযায়ী সাজানোর ব্যাপারেও।

পুরানো দিনের আলিবাবা (১৯৩৭), ইন্দিরা (১৩৯৭), কপালকুণ্ডলা (১৯৩৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৯৩২), খনা (১৯৩৮), গৃহদাহ (১৯৩৬), ছদ্মবেশী (১৯৪৪), জয়দেব (১৯৩৩ ও ১৯৪১), দক্ষযজ্ঞ (১৯৩৪), দেবদাস (১৯৩৫), নৌকাডুবি (১৯৪৭), পথের দাবী (১৯৪৭), পরিণীতা (১৯৪১), প্রিয় বান্ধবী (১৯৪৩),

বড়দিদি (১৯৩৯), বিরাজ বৌ (১৯৪৬), মা (১৯৩৪), শকুন্তলা (১৯৪১), শহর থেকে দূরে (১৯৪৩), শেষরক্ষা (১৯৪৪), সন্ধি (১৯৪৪), স্বয়ংসিদ্ধা (১৯৪৭) প্রভৃতি চলচ্চিত্রের সঙ্গে ঐ একই বিষয় ও গ্রন্থ অবলম্বনে পুনর্নির্মিত চলচ্চিত্রগুলির গুণাগুণ পরীক্ষা করলে এই তত্ত্বটি প্রমাণিত হবে। দেশ-কাল-পাত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হয়—এ সত্যটি আলোচ্য পুননির্মিত চিত্রগুলিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।[১১]

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত চিত্রগুলি অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বংকিমচন্দ্র, অনুরূপা দেবী, শৈলজানন্দ, প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতি সাহিত্যিকের উপন্যাস থেকে নির্মিত। প্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বনে চিত্র নির্মাণে সেকালে যে নিষ্ঠা ও আনুগত্য পরিচালকরা বজায় রাখতেন, একালে তা দেখা যায় না। তবে পৌরাণিক কাহিনী-ভিত্তিক চিত্রে, পুনর্নির্মাণের সময় তার মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্জনের

সুযোগটা থাকে বেশী। তাই দু'জন পটচিত্রের শিল্পী যদি একই বিষয়ে পট অংকন করেন, তবে তাতে পার্থক্য তো যথেষ্টই থাকার সম্ভাবনা—কেন না জড়ানো পটচিত্র মূলত: পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।

পটচিত্রের ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি—কিছুটা আর্থিক এবং কিছুটা শিল্পীর প্রতিভার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু চলচ্চিত্রের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য দেখা যায়, তা শুধু চিত্রের চমক সৃষ্টির জন্য নয়। বিষয়ের মুড ও বক্তব্য অনুযায়ী।

তাই চলচ্চিত্র দর্শনের সময় ক্যামেরা কোথায় বসানো হয়েছিল, তা মনে না রেখে বা না ভেবে, সমগ্র ধারাবাহিক ছবিটাই আমাদের মনে এক ধারাবাহিক ও সামগ্রিক রস সৃষ্টি করে।

ক্যামেরা বা চিত্রগ্রহণ বিষয়ক উপরোক্ত আলোচনাটাই অতি সরলভাবে করা হল শুধুমাত্র বর্তমান প্রসঙ্গের কথা ভেবে—নচেৎ চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এগুলি অ-আ-ক-খ ও নয়।

জড়ানো পটের ক্ষেত্রে এ ধরনের কৌশল দেখা যায় না, যেহেতু এর মধ্যে যন্ত্রের কোন স্থান নেই। তাছাড়া আবহমান কাল ধরে তারা বিষয়কে প্রায় একই সমতলে রেখে চিত্রায়িত করতে অভ্যস্ত। বিষয়ের 'মুড' নামক জিনিষটা তাদের জানা নেই। তাই সেখানে সমগ্র কাহিনীটাই সোজাসুজি সামনে রেখে আঁকা হয়। তাতে কিন্তু এর নাট্যধর্মীতা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না। কারণ উভয়

চিত্রের মধ্যে এই যে পার্থক্য, এটা মূলতঃ উপস্থাপনগত পার্থক্য। ইনি মনে করেন এভাবে করলে ভাল হবে, উনি মনে করেন ওভাবে করলেই ভাল—অনেকটা সেই একই বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্র পুনর্নির্মাণের ব্যাপারের মতই।

জড়ানো পটের দৃশ্য বিভাজন ও উপস্থাপন ইত্যাদি রীতির এঙ্গে চলচ্চিত্রের ঐ প্রকরণের যে পার্থক্যের কথা বলা হল, তার মূল কথাই হচ্ছে—প্রথমটির ক্ষেত্রে অসংখ্য দৃশ্যের একত্র সংহতি এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে একটি দৃশ্যের অসংখ্য খণ্ড-চিত্র। পূর্বোক্ত 'কালীয় দমনে'র পটচিত্রটির বিবৃতির সঙ্গে নীচের বিবৃতিটি পাশাপাশি রেখে পাঠ করা চলে।

'পথের পাঁচালী'র মূল গ্রন্থে এ জাতীয় একটি দৃশ্য ছিল: অসুস্থ হরিহর স্ত্রী সর্বজয়ার নিষেধ সত্বেও দৈনিক অভ্যাস বশতঃ কাশীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে ঘাটের সিঁড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। এই অংশটি চিত্রায়িত করতে গিয়ে সত্যজিত রায় যে চিত্রনাট্য রচনা করেন, তা হল:

[মিড লং শট্। প্যান] সর্বজয়া—তুমি কোথায় যাচ্ছ?

হরিহর—গঙ্গাস্নানে।

সর্বজয়া—কিন্তু কাল রাত্রে যে তোমার জ্বর হয়েছিল—আজ স্নানে নাই-বা গেলে?

হরিহর—আমি ভাল আছি। ওষুধ খেয়েছি যে—

সর্বজয়া—কিন্তু ঐ উঁচু ধাপ...

হরিহর চলে গেল। মিকসড্ টু।

[লং শট্] ঘাটে লোক স্নান করছে। কাট্

[লং শট্। প্যান] হরিহর স্নান শেষ করেছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। কাট্

[মিড ক্লোজ শট্] একজন সাধু হরিহরকে ডাকে। কাট্

[মিড ক্লোজ শট্] হরিহর ফিরে তাকায়।

[মিড শট্] সাধু হরিহরের দিকে তার চশমা এগিয়ে দেয়—কাট্

[মিড শট্] সাধু—আপনার চশমা

হরিহরের হাতে সাধু চশমা দেয়। কাট্

[মিড শট্ থেকে লং শট্। প্যান] হরিহরকে অসুস্থ দেখায়। অতি কষ্টে হরিহর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। দম ফেলার জন্য একবার দাঁড়ায়। কাট্

[লং শট্] দুজন স্ত্রীলোককে চলে যেতে দেখা যায়।

[একস্ট্রিম লং শট্] একটা দরজার মধ্য দিয়ে দেখা গেল হরিহর উঠে আসছে—হঠাৎ সে পড়ে গেল। ক্যামেরা ডান দিকে প্যান করে। একটি লোক এগিয়ে আসে এবং সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করে। মিকসড্ টু।[১২]

উপরোক্ত বিশদ বিবরণটি খুঁটিয়ে পড়লে, এক বাক্যে এটাই বলতে হবে যে—এ হল খণ্ড-চিত্র রচনার এক এলাহি ব্যাপার। হাতে আঁকা জড়ানো পটের একেবারে বিপরীত। এর ফলে জড়ানো পটের চিত্রগুলিতে এক ধরনের এক-ঘেয়েমি এসে যেতে পারে, অবশ্য সেটা আমাদের চোখে—আমরা যারা শহুরে ও চলচ্চিত্রমনস্ক—তাদের চোখে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড়ানো পট যে সংস্কৃতির ধারক, সেখানে তা প্রকৃত রস-বিস্তারে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। বরং বিস্ময়ে ভাবতে হয়, কি নিপুণ উপায়ে তারা দৃশ্য বিভাগ করে এই দুরূহ কাজটিকে কত সাবলীল ভাবে করে গেছেন—যেটা কিনা একালে এক বিশেষ শিল্পরূপে পরি-গণিত হতে চলেছে।

প্যানেলধর্মী চিত্র ও চিত্রনাট্য আলোচনার প্রসঙ্গে আর যে কথাটি সহজেই মনে আসে তা হল—একালের কমিক্‌স্। এগুলির নাম আর যাই হোক না কেন, তা মূলতঃ একটা কাহিনীর নাটকীয় চিত্ররূপই এবং উপরোক্ত দু'টি মাধ্যমের সঙ্গে এর আপাত দৃষ্টিতে কোন বিরোধ নেই।

চলচ্চিত্র ও কমিকস্—দুটির মধ্যে কে আগে সৃষ্টি হয়েছে, এ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই এ জন্যই যে, দুটির মধ্যেই একটি নিবিড় সম্বন্ধ আছে, তা বুঝতে পারলেই হল। যে পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র বা চিত্রনাট্য রচিত হয়, অবিকল সেই পদ্ধতিতেই কমিকস্ চিত্র অংকিত হয়। অর্থাৎ, চলচ্চিত্রে যা হয় ফিল্মের মাধ্যমে পর্দায় প্রক্ষেপ করে, এক্ষেত্রে তা হয় অংকনের মাধ্যমে কাগজে।

একালের জনপ্রিয় দুটি কমিকস্ 'অরণ্যদেব' ও 'যাদুকর ম্যানড্রেকস্'-এর চিত্রায়ণ পদ্ধতি দেখলে বা পড়লেও কিন্তু চলচ্চিত্র দর্শনের স্বাদই পাওয়া যায়। কারণ ওখানে চলচ্চিত্রের মত বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনীর মুড অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়—জড়ানো পটের মত এক সমতল থেকে নয়। কমিকস্‌গুলি জড়ানো পটের সঙ্গে ক্ষীণ সূত্রে আবদ্ধ—ছবির মাধ্যমে নাটকীয় ভাবে গল্প বলা। তবে এর বেশী ঘনিষ্ঠতা হল চলচ্চিত্রের সঙ্গে।

উপরোক্ত কমিকস্‌গুলিতে কাহিনী রচয়িতা ও চিত্রকরের নাম পাওয়া যাবে না। যিনি বা যাঁরা আকেন, তাঁরা নিশ্চয়ই রচয়িতার পুরো কাহিনীকে হুব

ঐ ভাবে উপস্থাপন করেন না। তাকে নিশ্চয়ই পট অংকনের বা চলচ্চিত্র গ্রহণের নিয়মানুযায়ী কিছু না কিছু পরিকল্পনা করে নিতেই হয়। তাকেই আমরা বলতে পারি চিত্রনাট্য। উপরোক্ত চিত্রমালায় সেই চিত্রকরের নাম না থাকলেও নিপুণ চিত্রনাট্য রচনার প্রশংসা করতেই হয়।

এ ব্যাপারে সর্বাধিক প্রশংসা দাবী করতে পারে বোধ হয় ক্ষুদে টিনটিনের গল্পগুলি। কারণ এর গল্প লেখক ও চিত্রকর একই ব্যক্তি বলে এবং তা আধুনিক কালের বলে। চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনার মতই তা চিত্রায়িত হয়েছে এবং উক্ত কমিকস্‌গুলি পড়লে বা দেখলে চলচ্চিত্র দর্শনের স্বাদই পাওয়া যায়—এ কথা নিশ্চয়ই সবাই স্বীকার করবেন।[১৩]

টিনটিনের 'মমির অভিশাপ' নামক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ তুলে ধরি। মূল কাহিনী হল : হাসপাতাল থেকে ফোন এল টিনটিনের কাছে যে, রোজ একই সময়ে সাতজন রোগীর উপর ভূতের ভর হয়। টিনটিন তাই হাসপাতালে গেল এবং নিজের চোখে এই ঘটনা দেখে একটি বৃহত্তর অপরাধের সম্বন্ধে ভাবতে বসল।

এই ঘটনাটি এগারোটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ চিত্রে এভাবে চিত্রায়িত হয়েছে : (১) টিনটিন ফোন ধরেছে, (২) টিনটিন দ্রুত হেঁটে চলেছে, সঙ্গে কুট্টুস, (৩) হাসপাতালের প্রবেশ পথে টিনটিন ও কুট্টুস, (৪) ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ, (৫) ডাক্তার, নার্স ও টিনটিন রোগীর ঘরের দিকে যাচ্ছে, (৬) রোগীর ঘরে ওরা সবাই, (৭) ডাক্তার ঘড়ি দেখছেন ও টিনটিন অপেক্ষা করছে, (৮) একটি বিরাট চিত্র,—(পূর্বের সাতটি চিত্রের সম-আয়তনের) সাতটি শয্যায় রোগীদের অদ্ভুত কাণ্ড, ডাক্তার নার্স সবাই হিমসিম খাচ্ছে, (৯) টিনটিন হাসপাতালের বাইরে চিন্তান্বিত, (১০) টিনটিন কুকুর নিয়ে পা চালালো, (১১) তার মাথায় প্রশ্ন : কিন্তু ক্যালকুলাসকে চুরি করার সঙ্গে এর সম্পর্ক ?[১৪]

ছোটদের জনপ্রিয় পাক্ষিক পত্র, 'আনন্দমেলা'য় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিত্র-কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। শিবাজীর বাল্যজীবনের কাহিনী নিয়ে রচিত এই চিত্র-কাহিনীতে চিত্রনাট্যকার রূপে একালের প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীতরুণ মজুমদারের নাম আছে এবং চিত্রকর শ্রীবিমল দাসের নাম আছে পৃথকভাবে।

অর্থাৎ এ থেকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে, এই চিত্রমালাটি একটি

চলচ্চিত্রের অংকিত রূপ এবং তা করা হয়েছে মূলতঃ চলচ্চিত্র গ্রহণের দৃষ্টিকোণ থেকেই। বাস্তবিক, এই ছবিগুলি দেখলে সেই কথাই মনে হয়—যেন ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ থেকেই গল্পটি চিত্রায়িত হয়েছে। যেহেতু এর নেপথ্যে রয়েছেন একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা—তাই এই চিত্রনাট্য হয়েছে অধিক পরিমাণ চলচ্চিত্র নির্মাণের রীতি অনুযায়ী।

চিত্র-কাহিনী বা কমিকস্ নির্মাণও যে ইদানীং ক্রমেই চলচ্চিত্রধর্মী হয়ে উঠছে, তার একটি উদাহরণ দেওয়া যায় 'টিন্‌টিন্' চিত্রমালার কাহিনী থেকেই। একটি কাহিনীতে দেখা যায়, শিল্পী আবজ সিনেমাটিক টেকনিকের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন কার্টুনের স্টাইল। 'লো-অ্যাঙ্গেল কম্পোজিশনে' চিত্রের সম্মুখ ভাগ নাটকীয় হয়ে উঠলেও, কার্টুনের রীতিতে আঁকা ছবির অন্যান্য অংশে শোনা যাচ্ছে প্লেনের মধ্যের কথাবার্তা। টিনটিন স্রষ্টা আরজ এভাবে সিনেমার নানা কৌশলকে চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যখন তখন ব্যবহার করে তাঁর বিস্তৃত রসবোধেরই পরিচয় দিয়েছেন।[১৪ক]

চিত্র-কাহিনী বা কমিকস্-এর এই নাট্যধর্মীতা এবং জড়ানো পটের সঙ্গে এর সাদৃশ্য—এই আলোচনার প্রসঙ্গে চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ অংশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যায়। চলচ্চিত্র যদিও গতিশীল, তবু তারও একটা পূর্ব পরিকল্পিত চিত্রনাট্য থাকে। সেই চিত্রনাট্য যেভাবে ফিল্মের জন্য রচিত হয় তা কোন অংশেই আলোচ্য চিত্রনাট্য বা জড়ানো পটের থেকে ভিন্নধর্মী নয়। অবশ্য সবাই যে একই নিয়মে চিত্রনাট্য রচনা করেন—এমন নয়। চিন্তা, রুচি এবং সর্বোপরি অংকন-দক্ষতা এর অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

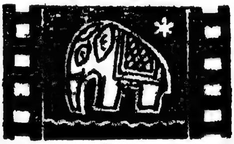

এ কালের মহান চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় যে তার চিত্রনাট্য রচনার সময় খাতার বাঁ দিকে মাঝে মাঝেই ধারাবাহিক চিত্রাংকন করে যান—এ তথ্য আজ বহু প্রচলিত। দৃশ্যটা চিত্রায়িত করলে শেষ পর্যন্ত কেমন দেখাবে—সেখানে পাত্র-পাত্রী ইত্যাদির অবস্থান কেমন হবে—তা পূর্বাহ্নে বুঝবার জন্যই এই ধারাবাহিক চিত্রাংকন প্রচেষ্টা। তাঁর 'জয় বাবা ফেলু নাথ' চিত্রের ছত্রিশ ও বিরানব্বই সংখ্যক শট-এর চিত্র-ভাষ্য এ' প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ

করা যায়। ঐগুলি পরপর সাজিয়ে একটু কাল্পনিক ধারাভাষ্য যোগ করে দিলেই, বেশ সুন্দর একটি ধারাবাহিক গল্প পাওয়া যায়।[১৪]

এই অভ্যাস আছে চলচ্চিত্রী পূর্ণেন্দু পত্রীরও। তিনি যে শুধু চিত্রনাট্যের পাশে মাঝে মাঝেই ধারাবাহিক চিত্রাংকন করেন এমন নয়, প্রয়োজন হলে অ্যানিমেশন চিত্রেরও চিত্রাবলী করে রাখেন আগে-ভাগে—যাতে পরবর্তীকালে চিত্রায়িত করতে অসুবিধা না হয়। অবশ্য গতিশীল চিত্রের চিত্রায়ন অপেক্ষা আপাত-স্থির কিন্তু গতিশীল অ্যানিমেশন চিত্রের চিত্রগ্রহণ পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে বলেই এটা করা সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে অনেকেরই তাঁর বহু বিতর্কিত 'স্ত্রীর পত্র' ছবির কথা মনে আসবে। মুক্ত পাখীর বিভিন্ন রূপ বোঝাবার জন্য তিনি যে প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার প্রাক্-রূপায়ণ কিন্তু ধারাবাহিক চিত্রেই। কম করেও ছয় প্রস্থ ডিজাইন করে তিনি তার এই বক্তব্য প্রকাশ করেন—যা স্থূল দৃষ্টিতে ধারাবাহিক চিত্রই। বিশেষতঃ একটা হাত যে ভাবে ধারাবাহিক অ্যানিমেটেড চিত্রের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পিস্তলে রূপান্তরিত হয়ে গেল—তা বোধহয় অ্যানিমেশনের চূড়ান্ত রূপ।

পূর্ণেন্দু পত্রী নিজে চিত্রশিল্পী বলেই তাঁর অ্যানিমেশন এত জীবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে—অন্ততঃ পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্রনাট্যটি পাঠের সময় এই ধারাবাহিক চিত্রগুলি দেখলে মূল চিত্র দেখার স্বাদ পাওয়া যায়।[১৬]

এত কথা বলা হল, শুধু জড়ানো পটের নাট্যধর্মীতা ও তার অদৃশ্য চিত্রনাট্য রচনার কথা মনে রেখে এবং যেহেতু পটচিত্র-চলচ্চিত্র-কমিকস্ তিনটিই হল ধারাবাহিক চিত্র মাধ্যমে গল্প বলা—তাই একই সূত্রে এগুলির আলোচনা দ্বারা একটি সমীকরণ করার চেষ্টা হল।

কিন্তু সাদৃশ্য এটুকু থাকলেও, বৈসাদৃশ্যটুকুই বোধ হয় বড় হয়ে দেখা দেয় শেষ পর্যন্ত। কেন না, জড়ানো পটচিত্রের নিছক বিবরণধর্মীতার সঙ্গে চলচ্চিত্র বা কমিকস্ চিত্রায়ণের বিশ্লেষণ ও নাট্যধর্মীতার যে একটি বিরাট পার্থক্য রয়েই গেছে—সেটাই বোধহয় এর একমাত্র কারণ। সেই সঙ্গে কাহিনীর গতিময়তাও একটি প্রশ্ন। চলচ্চিত্র গতিময়ই—তাই সে প্রসঙ্গে না গিয়েও বলা চলে, জড়ানো পট ও কমিকস্ চিত্রের গতির পার্থক্যও আকাশ-পাতাল প্রমাণ। এর জন্য চিত্রের সংখ্যাধিক্য ও চিত্রের স্বল্পতাই শুধু প্রধান কারণ নয়—এই পার্থক্যটি বিচার করতে হবে স্থান-কাল-পাত্র দিয়ে ও সর্বোপরি চিত্রকরের মানসিকতা দিয়েও।

বলা বাহুল্য যে, এই তিনটি প্রকরণের একত্র সমালোচনা মোটেই বিজ্ঞান সম্মত নয়। প্রকরণগুলির অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটি কিন্তু মূলতঃ এক বলেই মনে হয়। একালের কোন শিক্ষিত পটুয়াকে সব দিক দিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ে যদি চণ্ডীমঙ্গল বা মনসামঙ্গলের পট আঁকতে দেওয়া হয়, তবে সে শিল্পী নিশ্চয়ই একটি সুসংবদ্ধ চিত্রনাট্য রচনা করবে এবং তারপর অরণ্যদেব-ম্যানড্রেক-টিনটিনের কাহিনীর মতই সতী বেহুলা-লখীন্দর জাতীয় চলচ্চিত্রের পট-চিত্রণ করবে। কিন্তু যাদের জন্য এই নবধারার পট রচনা হবে—তারা কি সেটা তখন গ্রহণ করবে, না শহুরে বলে ফিরে যাবে নিজের গ্রামে—সেটাই হল বিবেচ্য !

প্রাসঙ্গিক তথ্য :

১। বাংলার পটকথা। প্রণব রায়। কৌশিকী ২য় বর্ষ, ৮, ৯ সংখ্যা। ১৩৭৯

২। বাংলার লোক শিল্প। ডঃ কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায। পৃঃ ৫২-৫৩

৩। শান্তিনিকেতন কলাভবন ছাত্রাবাস ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ ট্রাষ্ট আটপুর থেকে প্রচারিত পুস্তিকা

৪। পটুয়া সঙ্গীত। গুরুসদয দত্ত। পরিচায়িকা

৪(ক)। বাংলার প্রাচীন চিত্র ও পট। রমেশ বসু। বিচিত্রা। শ্রাবন ১৩৩৪। পৃ. ২৪৭

৫। Film as an Art। Marie Seton। pp. 51, 53

৬। অজিত পটুয়ার সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার। ১৯৮১, পূজার ছুটি

৭। বীরভূমের যমপট ও পটুয়া। দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ১১

৮। Film as an Art। Marie Seton। pp. 51, 53, 55, 57, 69

৯। বাংলার লোকসাহিত্য। ১ম। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃঃ ২৩৬

১০। বাংলার লোকশিল্প। ড. কল্যাণ গঙ্গোগাধ্যায়। পৃঃ ৫৩

১১। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস। ১ম। প্রণব কুমার বিশ্বাস। পৃঃ ৩৫-৩৯

১২। চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালনা। ধীরেশ ঘোষ। পৃঃ ৩

১৩। আনন্দমেলা শারদীয় ১৯৮৩। পৃঃ ১২৩-১২৫

১৪। আনন্দমেলা। পাক্ষিক। ২ জানুয়ারী, ১৯৮০

১৪। (ক) টিনটিন ও শিল্পী আরজ : একটি মূল্যায়ন—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ দেশ ১৮.৬.৮৩, পৃঃ ৫০-৫৫

১৫। প্রসঙ্গ চলচ্চিত্র। সেপ্টেম্বর ১৯৭৯। পৃঃ ১৫, ২২

১৬। কল্পনির্ঝর। অক্টোবর ১৯৮০। পৃঃ ১-৬৯

যীশু-পটের সন্ধানে

পট আঁকিয়েরা সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত কৃষ্ণলীলা প্রভৃতির কাহিনী অবলম্বনে পট তৈরী করে। তারা ধর্মনীতিব বিচারে হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মই আংশিকভাবে অনুসরণ করে। উপরোক্ত বিষয়বস্তুর সংগে গাজীর পট, সামাজিক পট ইত্যাদিও তারা তৈরী করে থাকে। এই সৎ শিল্পধারাটি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

মোটামুটি এইসব তথ্য তাদের পটের বিষয়বস্তু হিসেবে বহু প্রচলিত। প্রায় সকল পট অনুসন্ধানীই এ বিষয়ে তাদেব বিবৃতিতে এইসব তথ্য বিশদ ভাবে যথাযথ বিশ্লেষণসহ বর্ণনা করেছেন।

কেন তারা রামায়ণ-মহাভারত-কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে পট আঁকে অথবা কেনই বা তারা গাজীর পট আঁকে—এ প্রশ্নের খুব সবল উত্তর পাওয়া যায় যে, তারা একদিকে যেমন হিন্দু অপরদিকে তেমনই তারা মুসলমানও। তাই দুই ধর্ম সম্বন্ধে তাদের আন্তরিক কৌতুহলই ঐ ঐ বিষয়ে পট তৈরী করতে প্রেরণা দেয়।

তবে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এটাই তাদেব সমাজের প্রথা বা ঐতিহ্য। এই রীতিতে পট আঁকাটাই বরাবর চলে এসেছে।

বাস্তব জগতের রক্ত-মাংসের মানুষ বা ইতিহাসের চরিত্র নিয়ে রচিত হয়েছে পীরের পটগুলি—যেমন মাণিকপীর, সত্যপীর প্রভৃতি। হজরত মহম্মদ ঐতিহাসিক পুরুষ হলেও তিনি কখনই পটের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠেন নি। কেননা, ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী শুধু তার চিত্রাংকনই নয়, ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষের চিত্রাংকন করাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ—এমন একটা বিশ্বাস ইসলাম পন্থীদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

অপরপক্ষে নিমাই সন্ন্যাস জাতীয় পটগুলিও এই ঐতিহাসিক শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। যদিও উপস্থাপনের গুণে এই সব চরিত্র মানব অপেক্ষা দেবতা রূপেই বরাবর চিত্রিত হয়েছেন—এ ধরণের প্রকাশ ভঙ্গীর জন্য পটুয়াদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা বোধকেই দায়ী করা চলে।

সাধারণ মানুষ নিয়ে পটুয়াদের আঁকা প্রচুর পট আছে। তার বিষয়-বস্তু সমাজ থেকেই গৃহীত হয়েছে। এ বিষয়ে কালীঘাটের পটের কথা সর্বাগ্রে মনে আসে। বস্তুতঃ দেব চরিত্র অবলম্বনে চিত্রিত পট অপেক্ষা, সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে ব্যঙ্গধর্মী পট চিত্রনেই তাদের দক্ষতার কথা এখন বহু আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়। সমকালীন সাহিত্যের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ধারায় যেন এগুলি কালির পরিবর্তে রং নিয়ে সমাজ চিত্রনে এগিয়ে এসেছে।[১]

এই পটভূমিতে পটুয়াদের হাতে আঁকা 'যীশুপট' বিশেষ অভিনব ব্যাপার। যে সময় ও কাল অতিক্রম করলে কোন ধ্যান-ধারণা বা বিশ্বাস জাতির মনের গভীরে স্থায়ী আসন পাতে, এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম সে বয়স এখনও পায়নি বলেই মনে হয়। অন্ততঃ নিরক্ষর, অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত জনসমাজে তো বটেই। তার চেয়েও বড় কথা, যে পটুয়ারা এইসব কর্মে লিপ্ত আছেন, তাদের সমাজের সঙ্গে খ্রীষ্ট জনসমাজের পার্থক্য বেশ দূর।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ পটুয়ারাই যীশুপট এঁকেছেন এবং প্রচার করেছেন—এ কথা মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার অন্তর্গত কয়েকটা গ্রামে গেলে স্পষ্ট বোঝা যাবে। এখনও অর্ডার পেলেই করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব অল্প অংশই এ জাতীয় পট তৈরী করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পরিসরও এ যাবৎ তেমন হয়েছে বলে মনে হয় না। একদা দু-একটা ছোট মাপের পত্রিকায় পট সংক্রান্ত আলোচনায় 'যীশুপট' শব্দটি উল্লিখিত হয়েছিল মাত্র। প্রবন্ধ লেখকগণ সে পট স্বচক্ষে দেখেছিলেন কিনা তা সঠিকভাবে প্রকাশ করেননি—অনেকটা 'ইত্যাদি' ধরণের শব্দের মাধ্যমে যীশুপটের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করেছিলেন।[২]

বিষয়টি মেদিনীপুর জেলার পিংলা অঞ্চলের 'নয়া' নিবাসী ননীগোপাল চিত্রকরের সঙ্গে আলাপ করলে ভাল বোঝা যাবে।

এঁর আঁকা যীশুপটগুলি একক চৌকো পট। বিষয়বস্তু যীশুখ্রীষ্টের জীবনের নানা অংশ। তবে যে অংশগুলি চিত্রণে তিনি বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন

তা হ'ল : আস্তাবলে যাবপাত্রের মধ্যে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম, যীশুখ্রীষ্ট শিষ্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ধর্ম-উপদেশ দান করছেন, প্রান্তরে আত্ম-উপলব্ধির সময়ে ঈশ্বরের সংগে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ, কিংবা তাঁর ক্রুশারোহণে মৃত্যুর দৃশ্য।

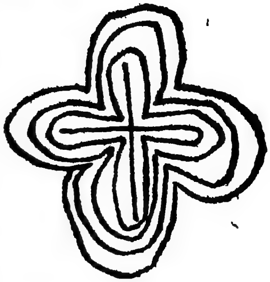

যীশুর সমগ্র জীবন থেকে যে বিষয়গুলি তিনি নির্বাচন করেছেন তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন একথা স্বীকার করতেই হবে। একজন যুগোত্তর পুরুষকে বুঝবার জন্য চিত্রকরের এই দৃশ্য নির্বাচন, বিশেষ উঁচু দরের বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটা আরও সপ্রমাণ হয়, যখন জানা যায় যে তিনি যীশুখ্রীষ্ট নিয়ে ধারাবাহিক কাহিনীর বা জড়ানো পট অাঁকেন নি।

ধারাবাহিক কাহিনী বর্ণনার জন্য অনেক পরিসর পাওয়া যায়—সে ক্ষেত্রে পটিদার বিষয় নির্বাচনে অনেক স্বাধীনতা পান। তাই জীবনের চুম্বকগুলি তুলে ধরবার ক্ষেত্রেও কিছুটা শিথিলতা দেখা দিতেই পারে। এ বিষয়ে রামায়ণ বা কৃষ্ণলীলা আশ্রিত জড়ানো পটগুলির কথা মনে করা যেতে পারে।

কিন্তু যে শিল্পীকে যে কোন কারণেই হোক না কেন, যদি নির্বাচিত কয়েকটি বিষযে চিত্রাংকন করতে হয়—তবে সেক্ষেত্রে অনেক বিচারের পরেই সঠিক নির্বাচনটি হয়।

আলোচ্য ননীগোপাল চিত্রকর সম্বন্ধেও এ মন্তব্য সর্বাংশে প্রযোজ্য।

এ বিষয়ে আরো অধিক চৌকো পট আঁকলে তিনি কি কি বিষয় নির্বাচন করতেন সে কথা জানা যায়নি বটে, তবে পুর্বোক্ত বিষয় নির্বাচনের নমুনা দেখে মনে করা যেতে পারে—হয়তো তা হত যীশুখ্রীষ্টের জীবনের নানাবিধ অলৌকিক কাজ বা পন্টিয়াস পাইলটের সামনে তাঁর বিচার-প্রহসনের কাহিনী বা তাঁর স্বর্গারোহনের কাহিনী ইত্যাদি।[৩]

তবে 'হেরোদ রাজার নির্দেশে নিষ্ঠুর শিশুহত্যা'—এই ঘটনাটা বোধ হয় পটুয়াদের বেশি আকর্ষণ করত। কেননা এর সংগে কংস রাজার শিশুহত্যার এক আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। সেক্ষেত্রে পটুয়া যে পূর্ব-অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই চিত্রটি অংকনে আগ্রহী হত—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে সে 'ক্রুশীয় মৃত্যুর' চিত্রাংকনের কষ্ট-কল্পনা থেকে অব্যাহতি পেত। কেননা, ক্রুশ-মৃত্যু বিষয়টাই এদের কাছে বিদেশী।

এ ক্ষেত্রে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী হয়েও ননীগোপাল 'বিষয় নির্বাচনের' এই দক্ষতা কিন্তু নিজেই অর্জন করেছে। যেহেতু এই পটের বিষয়-বস্তু তার নিজ অভিজ্ঞতার জগতের নয়, তাই সে বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এতই যদি তার যীশুপট অংকনে দক্ষতা, তবে সে এ বিষয়ে ধারাবাহিক কাহিনী-আশ্রিত দীর্ঘ জড়ানো পট তৈরী করে না কেন?

স্পষ্টতই এর কারণটা দ্বিবিধ: প্রথমতঃ জনরুচি ও জন-প্রতিক্রিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ আর্থিক ঝুঁকি নেবার অক্ষমতা।

প্রথম কারণটি বিশ্লেষণ করলে যা বেরিয়ে আসে তা হ'ল, যে সমাজে ননীগোপালরা পট দেখিয়ে বেড়ায় তা মূলতঃ হিন্দু-মুসলমান জনসমাজ। সে জনসমাজে যীশুখ্রীষ্টের জীবন-কাহিনী তত পরিচিত নয়। তাই দর্শক যে আগ্রহ নিয়ে এই পট দেখে তা ততটা আন্তরিক নয়। বা সেটা কোন বিশেষ ভাব দ্যোতকও নয়। তদুপরি, হিন্দুধর্মের অবতার-তত্ত্বের প্রভাবে গ্রামের জনমানসে যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ—সকলেই হয়ে পড়েন অতি লৌকিক দেবচরিত্র অর্থাৎ বিষ্ণুরই এক অবতার মাত্র।

সম্ভবতঃ এই অবতারবাদের জন্যই হিন্দু ধর্মের একটি লৌকিক রূপ ধীরে ধীরে জনমানসে আপন স্থান করে নিতে পেরেছে এবং পরবর্তীকালে সেইটাই হয়ে গেছে লোকায়ত ধর্ম। মন্তব্যটি হিন্দু ও মুসলমান উভয় জনসমাজ সম্বন্ধেই প্রয়োগ প্রয়োগ করা যেতে পারে। কেননা বিশুদ্ধ গ্রামীণ পরিবেশে হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামে পীরতলা ও ষষ্ঠীতলার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সকলেরই জানা আছে। এমন কি সত্যপীরও সত্যনারায়ণের পূজার প্রসঙ্গও এখানে তুলনীয় হতে পারে।

কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের এ হেন লৌকিক রূপ এখনও ততটা গড়ে উঠতে পারে নি। সম্ভবতঃ মূর্তি-পূজার প্রচলন না থাকাই এর একটা বড় কারণ। কিন্তু বৃহত্তর সমাজের প্রভাবে সে বৈশিষ্ট্যও আজ বোধহয় লুপ্ত হতে বসেছে—নচেৎ 'বড়দিনে'র দিনে শহর কলিকাতা বা তার উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলে 'খ্রীষ্টপূজা'র এত সমারোহ দেখা যেত না।[৪]

অবতারদের এই উদার নীতির ফলেই গ্রামীণ জনমানসে খ্রীষ্ট কোন ঐতি-হাসিক ব্যক্তিরূপে নয়, বোধহয় বিষ্ণুরই আর এক অবতাররূপে চিহ্নিত, চিত্রিত ও প্রচারিত হন। কেননা লোক-ধর্ম বা দর্শনের সঙ্গে যুক্তি চিন্তা ইত্যাদির

সম্বন্ধে বড় কম। ভবিষ্যতে হয়তো এমনও হতে পারে যে, শুধুমাত্র বাঁকুড়ার দশাবতার তাসের চিত্রের দৌলতেই অবতারদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে।

এবং ননীগোপালরা সেই ভাবনাকেই প্রকাশ করেন মাত্র। তাই রামায়ণ-কৃষ্ণলীলা-গাজীর পট দর্শকদের যেভাবে আগ্রহী করে, যীশুপটযে সে ভাবে পটিদার বা দর্শক কাউকেই আগ্রহী করে না—তা বলাই বাহুল্য।

তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের যে সব অঞ্চলে খ্রীষ্ট জনসমাজের বাস—আশ্চর্য্যের বিষয়, সেখানে কোন পটিদার পাড়া নেই। উদাহরণ স্বরূপ, নদীয়া জেলার চাপড়া অঞ্চলটির কথা ধরা যেতে পারে। খ্রীষ্টানদের এই ঘনবসতি অঞ্চলের নিকটেই যদি পটিদার পাড়া থাকত বা তাদের আসা যাওয়া থাকত, তবে তারা নিশ্চয়ই যীশুপট অংকনে আগ্রহী হ'ত এবং পটশিল্পের এ ধারাটি নিঃসন্দেহে বিশেষ সমৃদ্ধ হ'ত।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে খ্রীষ্টান মিশনারীরা একদা তাদের কেন্দ্র স্থাপন করেছিল বলেই, তাদের উৎসাহে ও নিকটবর্তী পুতুল-পাড়া 'ঘূর্নি'র অবস্থানের জন্যই কৃষ্ণনগরের সেই বিখ্যাত 'ক্রুশবিদ্ধ যীশু'-র মূর্তি তৈরী হতে শুরু করে—যা আজ বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে।[৫]

সুতরাং জনরুচি তত তীব্র না হওয়ার জন্যই পটিদাররা এ বিষয়ে দীর্ঘ জড়ানো পট অংকনে ততটা সময় দেন না—একথা যেমন সত্য, তেমনি অপর দিকে এর দ্বিতীয় কারণটি হল দর্শকের অর্থনৈতিক অবস্থাঘটিত—সে কথাও ভুললে চলবে না।

গ্রামে এর ক্রেতা একান্তভাবেই কম—যা-ও বা আছে, তা প্রচলিত ধর্মাশ্রিত পটের ক্রেতা। ভিন্নধর্মী পট সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ কম,—তার ওপর সেটি যদি জড়ানো পট হয় তো তার দাম দেবার মত তাদের সঙ্গতি কোথায়? সেক্ষেত্রে তাদের শহরে আসতে হয় এই বিষয়ের ওপর আঁকা জড়ানো পট বিক্রীর জন্য।

কিন্তু সেখানেও সমস্যা হ'ল, শহরাঞ্চলে এই যীশুপটের ক্রেতা কে হবেন? স্পষ্টতঃ খ্রীষ্টান ও শিক্ষিত সংস্কৃতিমনস্ক অখ্রীষ্টান সম্প্রদায়। অখ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে চিনে নেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু খ্রীষ্টান সম্প্রদায় অর্থাৎ যাদের জন্য এই পট রচনা—তাদের সনাক্ত করা গ্রাম্য পটুয়াদের পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

কেননা মুসলমানকে তার নাম দিয়ে চেনা যায়, আর হিন্দুকে তো বটেই—এগুলো পটুয়াদের জীবন অভিজ্ঞতা থেকেই এসেছে। কিন্তু ঐ পদ্ধতিতে খ্রীষ্টানকে চিনে নেওয়া যায় না। তাদের একাংশ যদিও ইংরাজী নাম পছন্দ করে—কিন্তু দিনে দিনে সকল খ্রীষ্টানই খাঁটি বাঙালী শব্দের নাম ধারণেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন।

সুতরাং যীশু পটের পটিদার কি করে সঠিক ক্রেতা খুঁজে পাবেন?

তাই দেখি, কলিকাতা শহরে এণ্টালী-তালতলা অঞ্চলে বা দক্ষিণ-পশ্চিম কলিকাতার ঠাকুরপুকুর-কেওড়াপুকুর অঞ্চলে বা উত্তর কলিকাতার দমদম-কেষ্টপুর সংলগ্ন অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে খ্রীষ্টান সমাজের বাস হওয়া সত্ত্বেও, যীশুপটের পটুয়ারা এসব দিকে প্রায় আসেন না বললেই হয়।

আরো আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে ব্রতচারী গ্রাম বা 'গুরুসদয় দত্ত লোক-সংস্কৃতি সংগ্রহশালা' পট সংগ্রহের জন্য সমগ্র বঙ্গদেশেই বিশেষ পরিচিত ও প্রসিদ্ধ—তার অবস্থান উপরোক্ত ঠাকুরপুকুর-এর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও এবং পটিদারদের ঐ সংগ্রহালয়ে আসা-যাওয়া সত্ত্বেও এইসব খ্রীষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে তারা তাদের যীশুপট দেখাতে আসেননি কখনও।

তবে যীশুপটের চর্চার অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে আর একটা উল্লেখযোগ্য কথা হ'ল—পটিদারেরা ভাল করে যীশুখ্রীষ্টের জীবন-কাহিনীই জানেন না।

এ বিষয়ে ননীগোপালের অভিমত হ'ল : একজন কেউ তাকে যীশুখ্রীষ্টের জীবনীটি সংক্ষেপে বলেছিল। সেইটি সম্বল করে সে এ যাবৎ চারটি মাত্র চিত্র আঁকতে পেরেছে।

তার প্রতিবেশী বিষ্ণুপদ চিত্রকরের অভিজ্ঞতাটা অবশ্য একটু ভিন্ন। শহরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে। অনেক সরকারী অনুষ্ঠানে তার অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে। বেতারে ও দূরদর্শনেও সে প্রোগ্রাম করেছে। শান্তিনিকেতনেও তাকে যেতে হয়েছে বহুবার পট দেখানোর ও বিক্রীর জন্য।

সেই বিষ্ণুপদ একদা 'ষ্টেটসম্যান পত্রিকা'র জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে—তাঁর স্ত্রী ছিলেন খ্রীষ্টান। তিনিই তাকে একটি ক্ষুদ্র যীশু-জীবনী দেন। সেটা পড়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে বিষ্ণুপদ একবার একটি দীর্ঘ জড়ানো পট তৈরী করে ঐ ভদ্রমহিলার জন্য।

তার জীবনে এ সুযোগ সেই একবারই এসেছিল। বাজার নেই বলেই এখন

আর সে যীশুপট করে না—এমন কি চৌকো পটও না। তবে যদি কেউ করে দিতে বলে, তবে সাগ্রহে সে কাজে রাজী হবে। এ অভিমত অবশ্য ননীগোপাল বা বিষ্ণুপদ—উভয় পটিদারেরই।

যেহেতু এ বিষয়ে জড়ানো পটের একান্তই অভাব, তাই লোকসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরা আর একটি রস থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেটি হ'ল যীশুপটের গান বা যীশুর জীবন কাহিনী বিষয়ক গান।

গান ছাড়া তো পট দেখা সম্ভব হয় না। এবং গান থাকে শুধুমাত্র জড়ানো পটের জন্যই—অর্থাৎ ধারাবাহিক দীর্ঘ কাহিনীর ব্যাখ্যার জন্য। ধারাবাহিক কাহিনী যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে তার ব্যাখ্যারও যে প্রয়োজন নেই—একথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

বাইবেলের বা যীশুখ্রীষ্টের জীবন-কাহিনী লোক কবির কণ্ঠে কি রূপ নেয়—এটা একটা অত্যন্ত কৌতুহলের ব্যাপার। রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি যেভাবে তাদের হাতে রূপ নিয়েছে এবং কণ্ঠে সুর নিয়েছে, যীশুখ্রীষ্টের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই সে রকমটাই হ'ত। তাহলে শুধু শিক্ষিত খ্রীষ্টান সমাজই নয়, সমগ্র সমাজই শুনতে পেতো, যীশু-জীবনের একটি লৌকিক কাব্য—হয়তো তা হয়ে উঠতো এক অভিনব পাঁচালী।

'পাঁচালী' শব্দটার সঙ্গে যে সংস্কৃতির যোগ, এরা সেই সমাজের লোক বলেই হয়তো এদের হাতের তুলিতে অতি সহজেই সত্যপীর অংকিত হয়, কণ্ঠে অনায়াসেই আসে সত্যপীরের পাঁচালী।

যদি কোনদিনও এই যীশুপট জড়ানো পট রূপে প্রচারিত হয়, তবে হয়তো তা থেকেই জন্ম নেবে 'যীশুর পাঁচালী' নামক এক অভিনব শব্দ।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে একদা এই বঙ্গ দেশেই দুই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা রচিত হয়েছিল সাহিত্যধর্মী যীশুজীবনী। তাদের নামকরণ হয়েছিল : সংস্কৃত ভাষায় 'খ্রীষ্টোপনিষদ' এবং বাংলা ভাষায় 'শ্রীশ্রীযীশুখ্রীষ্ট' ; তারও পূর্বে রচিত হয়েছিল অখ্রীষ্টানের কলমে 'খ্রীষ্টায়ন কাব্য'। দেখা যাচ্ছে সাধারণ জন-সমাজে অখ্রীষ্টানের হাতেই যীশুখ্রীষ্ট প্রচারিত হয়েছেন বেশি।[৬]

কিন্তু যীশুর জীবন কাব্য রূপে 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'খৃষ্ট' বা দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'খৃষ্ট মঙ্গল' একদা এদেশে সমাদৃত হয়েছিল। কাব্য রূপে এ গুলি কতটা সার্থক সে কথা বিচার করবেন সাহিত্য সমালোচক।[৭]

সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলি হল কাব্য শ্রেণীভুক্ত। কোনমতেই লৌকিক কাব্য বা পাঁচালীর সগোত্র নয়—নিতান্তই শিক্ষিত সচেতন শহুরে কবির রচনা।

ধর্মভীরু খ্রীষ্টান 'পাঁচালী' শব্দ শুনে হয়তো একটু বিব্রত হতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শাস্ত্রীয় ধর্ম যে নিয়মে ভক্তের মনে ঠাঁই করে নেয়, লৌকিক ধর্ম তার থেকে ভিন্ন পথে বিচরণ করে। শাস্ত্রীর ধর্মের সব চেয়ে সরল অংশটিই লোকমনে স্থায়ীভাবে গৃহীত হয় এবং তার সংগে ব্যক্তির দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ও কল্পনার মিশেলে তৈরী হয় তার লৌকিক রূপটা—যেটা অধিকাংশ সময়েই শাস্ত্রীয় ধর্ম অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়।

অবশ্য এ সবই কল্পনামাত্র। তবে ইতিপুর্বে পাঁচালী শব্দের উল্লেখ হওয়ায় সেই সূত্রেই এ সব আলোচনা। যীশুপটের সম্বন্ধে আর এক বৈশিষ্ট্যের কথা হল তার অংকন পদ্ধতি।

বস্তুতপক্ষে কালীঘাটের পট তার অংকন শৈলীর জন্য যে কারণে বিখ্যাত হযেছে, এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র যে পট অংকন-রীতি প্রচলিত আছে—এ দুয়ের মধ্যে তুলনা না করাই ভাল। উভয ধারাই বা বিশদ অর্থে পট অংকনের বহুবিধ ধারাই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে আছে বা থাকবে।

তাই রামায়ণ-কৃষ্ণকথা-গাজীর পট অংকনে পটুয়াদের যে দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে, যীশুর পটেও যে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে—এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু অভিজ্ঞতা এমন একটি জিনিষ যার জন্য প্রয়োজন হয় কিছু ঐতিহ্যের, কিছু প্রথা-সংস্কারের—অন্ততঃ লোকচিত্রকলার ক্ষেত্রে। এ মন্তব্য যথার্থ হয়ে উঠবে আলোচ্য পটিদারের আঁকা যীশুপটগুলি বিশ্লেষণ করলেই।

এগুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ইতিপুর্বে যা বলা হয়েছে—তা যথেষ্ট। কিন্তু অংকন রীতিতে এগুলি কোন মতেই রামায়ণ-কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি পটের থেকে ভিন্ন নয়। যীশুমাতাকে রামায়ণ বিষয়ক পটে বহুবার দেখা গেছে নানান ছাঁদে বা বৃক্ষতলে উপবিষ্ট যীশু শিষ্যদেরও দেখা গেছে তাদের আঁকা অন্যান্য পটে নানা চরিত্রে। তবে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশারোহা ঘটনাটি এমনই এক ব্যতিক্রম যে তার জন্য তাকে কিছুটা শিল্পীসুলভ কল্পনার জাল বিস্তার করতেই হয়েছে। হয়তো এর পিছনে তার মনে কোন পরোক্ষ অভিজ্ঞতা কাজ করে থাকতে পারে।

যীশুপট

পটিদার—ননীগোপাল চিত্রকর

কাজলরেখার আলপনা দেওয়া : দীনেশ চন্দ্র সেনের গ্রন্থ অবলম্বনে

কেননা ক্রুশারোহণে মৃত্যুর দৃশ্য দেখা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের পটিদারের পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু তা সত্বেও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশের লোকগুলিকে চিত্রিত করতে শিল্পীর বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। হোক না তারা খাটো ধুতি পরা বাউল চেহারার মানুষ, মেদিনীপুর পটিদার তার মধ্যেই আবিষ্কার করতে পারেন মানব অবতার যীশুখ্রীষ্ট বা তার শিষ্যদের।

বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে হর-গৌরী বিষয়ক প্রচলিত ছড়াগুলিতে হর ও গৌরী সম্বন্ধে যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে ঐ দুই চরিত্রের রাজভাব বা দেবভাব কিছুই প্রকাশিত হয়নি। পল্লীজীবনের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা দিয়েই তার সৃষ্টি। তাই একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেন, তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।[৮]

আলোচ্য যীশুপটের ক্ষেত্রেও শিল্পীর বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এই মন্তব্য ভীষণভাবে সত্য।

ঐতিহ্যবাহী পটের ক্ষেত্রে দীর্ঘ-পোষিত যে সংস্কারের দ্বারা তারা প্রভাবিত ও পরিশীলিত হয়ে চিত্রকর্ম করে, যীশুপটের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয় বলেই এ বিষয়ে শিল্পীর শিল্পদক্ষতা মনে হয় নিতান্তই আরোপিত বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। তাই নতুন কোনরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন না যীশুখ্রীষ্ট বা তাঁর জীবনলীলা।

তবে অবাক করে দেয় ননীগোপালের আঁকা সেই যীশুপটটি—যেখানে স্রষ্টার সঙ্গে যীশুর সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা আছে। উর্দ্ধে মহাশূন্যে মেঘের নেপথ্য হতে স্রষ্টার একটি আঙ্গুলমাত্র এগিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে এবং যীশুখ্রীষ্ট তার একটি হাত তুলে রেখেছেন উর্দ্ধপানে—উভয়ের মধ্যে মহাশূন্যেই সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে।

স্রষ্টার সংগে সৃষ্টির মিলনের এই যে ব্যঞ্জনা—তা তিনি কোথা থেকে পেলেন? চিত্রটি সামান্য, কিন্তু যীশুখ্রীষ্টকে তিনি এই চিত্রে নিছক মানুষরূপে চিত্রিত করেন নি—তিনি যে স্বয়ং ঈশ্বরের অংশ এবং তাঁরই অবতার মাত্র—সামান্য কয়েকটি টানে সেটা প্রকাশ করার দুরূহ চেষ্টা করেছেন এবং বলতে দ্বিধা নেই, তাতে সার্থকভাবে সফল হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, মনে আসে মাইকেল এঞ্জেলোর সেই বহুবিখ্যাত চিত্রটি—'দ্য ক্রিয়েশন অব অ্যাডাম', সেখানে পৃথিবীর আদি মানুষ আদম সৃষ্টির পর বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য মাইকেল এঞ্জেলোর মত বিশাল প্রতিভা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল, মেদিনীপুরের ননীগোপাল চিত্রকর সেই সত্য প্রকাশের জন্য সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করল।

একদিকে প্রকাশ্যে পৃথিবীর মানুষ, আর একদিকে নেপথ্যে মেঘলোকে বিশ্বস্রষ্টা—উভয়ের সম্বন্ধ রচিত হচ্ছে একটিমাত্র অঙ্গুলি-স্পর্শের দ্বারা। স্থান কাল পাত্রভেদে কি অদ্ভুত সাদৃশ্য। মাইকেল এঞ্জেলো ও ননীগোপাল চিত্রকর এখানেই যেন একসূত্রে বাঁধা পড়ে গেছেন।

এসব ছাড়া অংকনের অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বর্ণ-নির্বাচনের প্রসঙ্গে তা একান্তভাবেই ঐতিহ্যবাহী।

তবে যীশুখ্রীষ্টের প্রতিকৃতি অংকনে এই পটিদার কিছুটা বাঙ্গালীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। একটা গ্রাম্য বাউল ধরনের মানুষ, গালে দাড়ি, গাত্রবর্ণ সাদা, হাঁটুর একটু নীচে নেমেছে ধুতি জাতীয় বস্ত্র, উর্ধাঙ্গ অনাবৃত—এই সরল পরিচ্ছদে ননীগোপালের খ্রীষ্ট আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। যীশুমাতা বা যীশুশিশু সম্বন্ধেও এমন সরল বিশ্বাসই নিতান্ত বাঙালী হয়ে সরল ভাবেই চিত্রিত হয়।

বিদেশী ব্যক্তির বা পরিবেশের এমন অবিশ্বাস্য সরলীকরণ লোকচিত্রকলায় মোটেই অস্বাভাবিক নয়, বরঞ্চ এটা হয় বলেই তাকে লোকচিত্রকলার পর্যায়ভুক্ত করা যায়—নচেৎ সমালোচকগণ হয়তো তাকে 'চিত্রকলায়' ভূষিত করতেন।

যীশুখ্রীষ্টের প্রতিকৃতি অংকনে এই লৌকিক রীতিটি শুধু যে পিংলা থানার নয়া গ্রামের ননীগোপাল পটিদারই প্রথম প্রয়োগ করেছেন তা নয়, চিত্রকলায় পরিশীলিত মার্জিত ধারাতে যীশুখ্রীষ্ট ইতিপূর্বে বহুবারই অভিনব লৌকিক রীতির কাছাকাছি এসেছেন।

এ বিষয়ে যামিনী রায়ের খ্রীষ্ট বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। টেম্পারা পদ্ধতিতে আঁকা তাঁর 'Dead Christ' চিত্রটি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিত্রটির অংকনরীতি নিঃসন্দেহে লৌকিক রীতি অনুসারী। পরিচয়পত্র না থাকলে

সাধারণ দর্শকের পক্ষে বোঝা কষ্টকর—কে এই হতভাগ্য—যাঁর দেহ লুটিয়ে পড়েছে তিন রমণীর কোলে !

অনুরূপ মন্তব্য করা যায় তাঁর 'The Virgin and Child Christ' চিত্র সম্বন্ধেও। এটি টেম্পারা পদ্ধতিতে আঁকা হলেও চিত্রবিন্যাসে একান্তভাবেই বাঙ্গালী হয়ে উঠেছে। 'ম্যাডোনা' চিত্রের সার্থক লৌকিক রীতির প্রকাশ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ চিত্রটির পাদদেশে একসারি মাছের নকশা থাকায় তা যেন আরো বঙ্গীয় হয়ে উঠেছে।

আর 'Jesus Christ with cross' চিত্রটি যে একটি সার্থক লৌকিক রীতির যীশুখ্রীষ্ট—এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। হ'তে পারে তা আলোচ্য ননীগোপালের মত নয—তবু যামিনী রায়ের দৃষ্টিতে তা এইভাবেই ফুটে উঠেছে। প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে সামান্য পার্থক্য—এটা তেমন বড কথা নয়।

যামিনী রায়ের এই খ্রীষ্টমুখীনতা সম্বন্ধে সমালোচক অজিত দত্ত বলেছেন যে, সাঁওতালদের বিষয়বস্তুর দিকে মুখ ফিরানো—এটা হ'ল তার চিত্র রচনার একটি পর্যায়। তারই সম্প্রসারিত রূপ বোধ হয খ্রীষ্টের দিকে এগিয়ে যাওয়া। শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে এটা বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। তিনি নিজে কিন্তু যীশু-জীবন বা বাইবেল কাহিনী সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না। যেভাবে তিনি খ্রীষ্টকে চিত্রায়িত করেছেন—সেটা একান্তভাবে তাঁরই। একদিকে উত্তুঙ্গ স্বর্গীয় ভাব অপর দিকে কোমলতার প্রকাশ, একদিকে চরম মানবিক অপরদিকে ভীষণ স্বর্গীয়—এটাই হ'ল তাঁর খ্রীষ্ট বিষয়ক চিত্র রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৯]

ননীগোপাল সম্বন্ধেও এই মন্তব্যটি ভীষণভাবে সত্য। এই প্রসঙ্গে শিল্পী অশোক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (১৯১৩—১৯৬৯) একটি চিত্রের উল্লেখ এখানে করতে হয়। এটি একদা 'দেশ' পত্রিকার প্রচ্ছদে প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য তার আগে বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শনীতে তা স্থান পেয়েছে। তাঁর এই যীশু চিত্র সম্বন্ধে সে সময়ে ঐ পত্রিকার প্রচ্ছদ পরিচিতিতে সমালোচক যা লিখেছিলেন, তা এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

'তিনি (শিল্পী) যে মানুষের শুভবুদ্ধির ওপর আস্থা হারাননি প্রচ্ছদে মুদ্রিত যীশুখ্রীষ্টের মুখ তার প্রমাণ। এই তৈলচিত্রের মুখের আদল পূর্ব রীতি অনুসারী—কিছুটা পটচিত্র এবং কিছুটা প্রাচ্য রক্ষণশীল খ্রীষ্টধর্মের আইকনের মতো। ক্ষমাসুন্দর করুণাপ্লুত মুখ ঈষৎ দীর্ঘায়িত এবং চোখ দুটো টানা টানা।'[১০]

যীশুখ্রীষ্টকে লৌকিক রীতিতে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নন্দলাল বসুর নামও মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের 'খৃষ্ট' গ্রন্থের প্রচ্ছদটি তাঁরই আঁকা। এখানে খ্রীষ্ট নিজের ক্রুশ নিজেই বহন করছেন—এটিই প্রধান বিষয়, যা এর পূর্বে যামিনী রায়েরও বিষয় হয়েছিল। তাঁর যীশুও কিন্তু পুরোপুরি বাস্তবের নয়—লৌকিক রীতির লক্ষণাক্রান্ত।

এভাবে শিল্পীদের নাম উল্লেখ করে করে আলোচনা না করলেও, যীশুপটের বাইরেও আধুনিক কালের মার্জিত শিল্পধারায় বহু শিল্পীই যে যীশুখ্রীষ্টের এক লৌকিক রূপ এতদিনে সৃষ্টি করে নিতে পেরেছেন—একথা বোধ হয় বলা যেতে পারে এবং ননীগোপালরাও তার একটি বড় অংশীদার।

এদেশে পট সংগ্রহের সংগ্রহশালা আছে। বেশ কিছু সংখ্যক পট নিয়ে বড় মাপের প্রদর্শনীও হয়েছে একাধিকবার। যে শিল্প বা শিল্পরীতিটি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বা দুর্লভ হয়ে উঠছে—সে সম্বন্ধে এই পট সংগ্রহশালাগুলি বা পট প্রদর্শনীগুলির ভূমিকা কতটা ইতিবাচক—সে বিষয়ে বোধহয় কিছুটা চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে। বিশেষতঃ আধুনিক চিত্রসমালোচক যখন এইসব পটুয়াদের সম্বন্ধে বলেন 'অ্যাপেনডিকসের মতোই চিত্রকররা এখনও টিকে আছেন'—তখন এই বিষয়ে আলোচনাটা অত্যন্ত জরুরী বলেই মনে হয়।[১১]

পট নিয়ে বেশ বড়ো মাপের একটা প্রদর্শনী হয়েছিল একদা এই শহর কোলকাতাতে এবং খোদ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই—সময়টা ছিল উনসত্তর সালের এপ্রিলের শেষ দিন থেকে মে-র দুই তারিখ অবধি।

হরেক রকম পটের সমারোহ হয়েছিল সেখানে। কিন্তু আশ্চর্য্য যে যীশুপটের স্থান বোধহয় হয়নি সেখানে। সাপ্তাহিক পত্রের চিত্র সমালোচক সবরকম পটের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন—কিন্তু যদি সেখানে এই প্রায়-লুপ্ত পটটি প্রদর্শিত হ'ত, তবে তিনি নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে দু-চার কথা বলতেন।[১২]

প্রদর্শনীতে যদি দুর্লভ কোন সামগ্রীই প্রদর্শিত না হ'ল—তবে তার মূল্য কি? বিশেষ করে যে প্রদর্শনী আয়োজিত হয় কালেভদ্রে! দুর্লভ বস্তুর সংগে দর্শকের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটাও তো প্রদর্শনীর একটা কাজ!

অনুরূপ মন্তব্য করতে হয় এদেশের বড় বড় পট সংগ্রহশালাগুলি সম্বন্ধেও। ইতিপূর্বে 'গুরুসদয় দত্ত লোক-সংস্কৃতি সংগ্রহশালা'র উল্লেখ করা হয়েছে—কিন্তু সেখানে শতেক রকমের পট সমাবেশ ঘটলেও, যীশুপটের সন্ধান মিলবে না।

এখানে সংগৃহীত পটগুলি মূলতঃ বাংলাদেশ থেকে হলেও, বীরভূমের থেকে সংগৃহীত পটের সংখ্যাও কম নয়। সাহেবপট, গাজীপট, যমপট বা চক্ষুদানপট ইত্যাদি বিশেষ ধরনের পট ছাড়া অন্যান্য সাধারণ পট যথেষ্ট পরিমাণেই সংগৃহীত আছে এখানে। কিন্তু পটের যে ধারাটি প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে তার জন্য এঁদের কোন সমবেদনা নেই।[১৩]

অন্যান্য সংগ্রহশালার কথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন—কেন না পট সংগ্রহ ও সৌকর্যে আলোচ্য সংগ্রহশালাটিই অধিক প্রসিদ্ধ।

সংগ্রহশালাতেও এগুলি যদি সযত্নে সংগৃহীত হত, তবে সাধারণ মানুষ তার সম্বন্ধে জানতে পারত। অন্ততঃ ইতিহাস লেখার জন্যও তো তার একটা দুটো উল্লেখযোগ্য নমুনা থাকা প্রয়োজন ছিল।

শিল্পবিচারে বা প্রভাব বিস্তারকারী মাধ্যমরূপে যীশুপট তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও, একদা এটি কোনো কোনো শিল্পীর হাতে সৃষ্টি হয়েছিল—কিন্তু এ তথ্যটি প্রচলিত পট বিষয়ক গ্রন্থেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যদিও পট বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থের সংখ্যা এদেশে যথেষ্টই আছে।

একদিকে শিল্পীর হাতে তার চর্চা যেমন বন্ধ হতে চলেছে, অন্যদিকে গবেষক বা সংগ্রাহক—সেখানেও যেন কোন অলক্ষ্য নিয়মে তার চর্চা বন্ধ হয়ে গেছে।

তখনই প্রশ্ন জাগে, যে পটিদার জন্মসূত্রে না হিন্দু না মুসলমান, যে পটিদার জন্মসূত্রে হিন্দু হয়েও মুসলমান এবং মুসলমান হয়েও হিন্দু—তার কি প্রয়োজন ছিল যীশু পট অংকনের ?

প্রায় সকল গবেষকই এ কথা জানিয়ে গেছেন যে—দু'ধর্মের সীমান্তদেশে দাঁড়িয়ে পটুয়ারা কোনদিনই কোন সমাজকেই খুশী করতে পারেনি। কোন হিন্দুই তাকে বর্ণ-হিন্দু কেন, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বলেও স্বীকৃতি দেননি। তাকে অচ্ছ্যুত বলে গণ্য করেছেন।

অপরপক্ষে, কোন প্রকৃত মুসলমানই এদের আপনজন বলে বুকে টেনে নেন নি। তাই এই অদ্ভুত সমাজটির বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম হয় হিন্দু বা মুসলমান সমাজে নয়—পটুয়া সমাজেই।

আজো এরা কোন হিন্দু অতিথিকে বাড়িতে ডেকে এনে এক মুঠো ভাত খাওয়াতে পারলে—বা নিদেনপক্ষে জল খাওয়াতে পারলেও মনে স্বস্তি পান যে—তাহলে বোধ হয় জাতে ওটা গেল।[১৪]

অনুরূপ আচরণ প্রকাশ পায় মুসলমান সমাজ সম্বন্ধেও।

তাই দিনের পর দিন শাঁখা-সিঁদুর-পূজার পরেও তাদের কলেমা-নামাজ-জাকাত পড়ার প্রথা বজায় রেখেই চলতে হয়। মেনে নিতে হয় সামাজিক ব্রাত্যের জীবন—যা তাদের জীবনের জন্মসঙ্গী।

এই প্রচ্ছন্ন ধিক্কার বোধ থেকেই কি তারা নিজ ধর্ম ছেড়ে মাঝে মাঝে পা বাড়ায় নবধর্ম অর্থাৎ খ্রীষ্ট ধর্মের দিকে? যদি সে ধর্মের মানসিক আশ্রয়ে তাদের কোন পরিচয় তৈরী হয়—এই অক্ষম বাসনায়? নচেৎ আজীবন এক পরিবেশে ও বিশ্বাসে লালিত-পালিত হয়েও কেন অন্য পরিবেশের মধ্যে নিজের শিল্পী সত্তা জাগরণের চেষ্টা?

হয়তো চণ্ডালিনী কন্যা প্রকৃতির মতই এদের অন্তরের বেদনা 'জন্ম কেন দিলি মোরে, লাঞ্ছনা জীবন ভ'রে'—সঙ্গীতে প্রকাশ না পেয়ে রঙের রেখায় প্রকাশ পেয়েছে—যার মাধ্যম হয়েছে যীশুপট।

সমাজতত্ত্বের পটভূমিতে এদের দাঁড় করিয়ে মনোবিজ্ঞানী এই সব সিদ্ধান্তে সহজেই আসতে পারেন। কিন্তু নৃতাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ পদ্ধতি কিঞ্চিৎ ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

সীমিত সামাজিক সুযোগ-সুবিধার মধ্যে থেকেও তারা যে প্রচলিত রীতি-নীতি বা চিত্রাংকনের বিষয়বস্তু থেকে কখনই খুব দূরে সরে আসেনি—এ কথা গবেষকগণ স্বীকার করেছেন। তাই যত বিভিন্ন বিষয়েই তারা পট এঁকে থাকুন না কেন, তা মূলতঃ রামায়ণ, কৃষ্ণকথা নিমাই-পট, গাজী-পীরের পট, সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ক পট—ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[১৫]

তাই এ বিষয়েই তাদের যত কলা-নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। অপর ক্ষেত্রে ননীগোপাল-বিষ্ণুপদরা যতই কেন ব্যক্তিগত চাহিদার ভিত্তিতে যীশুপট আঁকুক, তা' কখনই তাদের চিত্রে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে দেখা দেয়নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলা যায়, তাদের চিত্রপট কখনই তাদের চিত্তপটকে রাঙিয়ে তুলতে পারেনি।[১৬]

সঙ্গত কারণেই তাই তাদের যীশুপট পট আঁকার মূল ধারার সঙ্গে একীভূত

হতে পারেনি এ'গুলি চিরদিনই রয়ে গেছে 'অর্ডারী মালে'র মত—সৌখীন, পোষাকী। তাই সংগ্রহশালায় বা প্রদর্শনীতে এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না এবং দু'দিন পরে ননীগোপাল-বিষ্ণুপদ-রা হারিয়ে গেলে এই ধারার পটও চিরতরে হারিয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. হুতোম প্যাঁচার নকশা। কালীপ্রসন্ন সিংহ। পৃঃ ৩৮, ৪১, ৪৪ ইত্যাদি

২. বাংলার পটকথা। প্রণব রায়। কৌশিকী। ২য় বর্ষ—৯-১০ সংখ্যা প্রতিবর্ত। বর্ষ ১, সংখ্যা ১। ১৯৮২

৩. মথিলিখিত সুসমাচার। নিউ টেষ্টামেণ্ট—বাইবেল

৪. আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৬ ১২ ৮৩, যুগান্তর পত্রিকা : ২৬.১২.৮৩

৫. কৃষ্ণনগরের যীশু। শ্রীহর্ষ মল্লিক। বিশ্বজ্যোতি, ফেব্রুয়ারী '৮৪

৬. খ্রীষ্টায়ণ কাব্য—রামরাম বসু (১৮১০), খ্রীষ্টোপনিষদ—তারাচরণ চক্রবর্তী (১৯৪০), শ্রীশ্রীযীশুখ্রীষ্ট—বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫২)

৭. দেবেন্দ্রনাথ সেনের খৃষ্ট মঙ্গল। শ্রীহর্ষ মল্লিক। নবায়ণ। ১৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। অক্টোবর ১৯৮১

৮. লোকসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১০২

৯. Jamini Roy. Introduction—Ajit Dutta. Lalit Kala Academy

১০. দেশ—১৯.৯.৮০। প্রচ্ছদ পরিচিতি

১১. শিকড় (শিল্পসংস্কৃতি)। সন্দীপ সরকার। দেশ ২৫.৮.৭৯

১২. প্রাগুক্ত

১৩. কিউরেটরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার। ৪.৩.৮৪.

১৪. দেখা হয় নাই। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৪০

১৫. বাংলার লোক সাহিত্য। প্রথম খণ্ড। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃঃ ২৩৭-২৪০

১৬. ফাল্গুনী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ২৯

রবীন্দ্রনাথ ও লোকচিত্রকলা

এক

অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা' উপন্যাসে সুবচনীর খোঁড়াহাঁস যে ভাষায় অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় দিয়েছে 'ওবিন ঠাকুর ছবি লেখে, তা এখন প্রবাদ গোত্রীয়। বস্তুতঃ ছবিটা যে আঁকার বস্তু লেখার নয়, অপর পক্ষে লেখাটাও যে ছবির মত হতে পারে—এই প্রাসঙ্গিক ব্যাপার নিয়ে যত দ্বন্দ্বই উপস্থিত হোক না কেন, ঐ সংক্ষিপ্ত সরল বাক্যটির তলদেশে পৌঁছান তেমন শক্ত ব্যাপার নয়।

কথাটা শুধু যে অবনীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে প্রযোজ্য তা' নয়। যখনই কোন কথা প্রবাদ-তুল্য হয়ে যায়, তখন তা হয় সাধারণের সম্পত্তি। বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ জনকে নিয়ে একদিন তার উৎপত্তি হয়তো হয়েছিল—কিন্তু এখন তা নির্বিশেষ হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও কথাটা বোধহয় প্রয়োগ করতে পারা যায়। ছবি লেখা নামক ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে এতই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, যে তখন তিনি লেখনী ও তুলি—এই উভয় মাধ্যমেই চিত্র এঁকে চলেছেন।

বস্তুতঃ ছবি লেখা ব্যাপারটায় অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন অংশে কম নন, তা কবির শেষ বয়সের কাব্যগুলি নাড়াচাড়া করলেই বোঝা যায়। তবে মূল পার্থক্য ছিল, একজন প্রকৃত চিত্রশিল্পী, মনের খেয়ালীপনায় সাহিত্যিক এবং অপরজন মূলতঃ কবি, মনের খেয়ালে শিল্পী।

তাঁর 'ছড়া', 'ছড়ার ছবি' এবং 'খাপছাড়া'—প্রধানতঃ এই তিনটি কাব্য-গ্রন্থকেই মোটামুটিভাবে চিত্রধর্মী বলা যেতে পারে।

বাংলা ছড়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একদা তিনি বলেছিলেন, এগুলি যেন সব টুকরো টুকরো অসংখ্য চিত্রের সমাবেশে গঠিত। তাই প্রথম চিত্রের সঙ্গে শেষ চিত্রের বিষয়ে কোন প্রকার ধারাবাহিকতা দেখা যায় না। শুধু তাই নয়

বিষয়-বস্তুর এই চিত্রধর্মীতা প্রতিক্ষণেই পরিবর্তিত হচ্ছে। মূলতঃ এগুলি শিশু মনোরঞ্জন ছড়া, তাই চিন্তার সম্পূর্ণতা বা ধারাবাহিকতার ব্যাপারে তার কোন মাথা ব্যথা নেই। বিশেষ কোন চিত্র বা চিন্তা নিয়ে সে বেশীক্ষণ মনোযোগী থাকতে চায় না। তাকে ভুলিয়ে রাখার জন্যই প্রতি মুহূর্তে ছড়া আবৃত্তি-কারিণীকে নব নব চিত্র বা ঘটনা সমাবেশ করতে হয় তার ছড়াতে। ফলতঃ অধিকাংশ ছড়াই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে একটি খণ্ড চিত্রের চিত্রাবলী।[১]

ছড়া বিশ্লেষণ সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা বলেছেন, সে সব কথা পরে তিনিও নিজের রচনায় প্রকাশ করেছেন। পরিণত বয়সে যখন তিনি ছড়া রচনায় হাত দিলেন, তখনও তার ভূমিকায় বললেন: 'এলোমেলো ছিন্নচেতন টুকরো কথার ঝাঁক' এবং 'কারো আছে ভাবের আভাস কারো নেই বা অর্থ'।[২]

তাঁর পরিণত বয়সের কবিতা 'চলতি ছবি'—তাতেও এই খণ্ড খণ্ড চিত্রের সমারোহ—অবশ্য তা যথার্থ শিশুপাঠ্য নয়। কিন্তু ক্ষণ-জীবনের এই চলচ্চিত্র-ধর্মীতাকে তিনি কাব্যচ্ছন্দে বাঁধবার চেষ্টা করেছেন। অনুরূপ মন্তব্য করা চলে 'চলচ্চিত্র' কবিতা সম্বন্ধেও। শিশুপাঠ্য এই কবিতায় অবশ্য দৃশ্যমান জগতেরই প্রাধান্য। কবিতা দু'টি যথাক্রমে তাঁর 'সেঁজুতি' (১৯৩৮) ও 'চিত্র-বিচিত্র' (১৯৫৪) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

এই সব ছড়াগুলোতে যে একের পর এক ছবির মালা গাঁথা হয়েছে—যার কোনটি সম্পূর্ণ, কোনটি বা অসম্পূর্ণ, সে গুলিও যেন এক বিশাল চিত্রকাহিনী। এগুলির মধ্যে যদি গতিময়তা থাকত তবে নিশ্চয়ই তাকে চলচ্চিত্র বলা যেতে পারত—যা কিনা কথা দিয়ে তৈরী। অথচ সেই টুকরো টুকরো ছবিগুলো কত সম্পূর্ণ ও কত স্পষ্ট। পরিবর্তে এই খণ্ড খণ্ড চিত্রমালাকে লোকচিত্রকলার একটি বিশিষ্ট মাধ্যমের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গ্রামে গঞ্জে একদা যে জড়ানো দীঘল পটের প্রচলন ছিল—এ ছড়াগুলি যেন কতকটা সেই রকম। পটের টুকরো কাটা কাটা ছবিগুলো একসঙ্গে জুড়ে দিলে যেমন একটা ধারাবাহিক গল্প বেরিয়ে আসে, আদতে যা পৃথক পৃথক—ছড়াগুলি যেন সেই রকমই।

বাস্তবিক লোকসংস্কৃতির এই দুই উপকরণ অর্থাৎ ছড়া ও জড়ানো পট যে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হতে পারে—তা এই দুটিকে পাশাপাশি না রাখলে সঠিকভাবে বোঝা যাবে না।

'সোনার তরী-চিত্রা' পর্বে বাংলার গ্রামীন জীবনের সঙ্গে যখন তাঁর ঘনিষ্ঠ

যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে, তখন তিনি বাংলার দৈনন্দিন জীবন ও তাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠে না। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর কৌতুহল জেগেছিল তখন থেকেই—কারণ গ্রাম-জীবন ও লোকসংস্কৃতি তো একই টাকার এপিঠ ওপিঠ মাত্র।

লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে এই আগ্রহ শুধু মাত্র নিজের চিন্তা বা ছিন্নপত্রের অজস্র পত্রাবলীর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি। এগুলি সংরক্ষণের জন্য নানা চিন্তা তাঁর মাথায় এসেছিল এবং সেজন্য তিনি কিছুটা উদ্যোগীও হয়েছিলেন। প্রখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ('মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' খ্যাত মৈত্রেয়ী দেবীর পিতা) মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয় তাঁর পত্রালাপ হয়।[৩]

জানি না তাঁর সেই আগ্রহের মধ্যে পট ও জড়ানো পট ছিল কিনা। তাহলে নিশ্চয়ই তার বৈশিষ্ট্য সেদিন তিনি অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। যদি পরবর্তী কালে তিনি এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহকে আরো প্রসারিত করে দিতেন, তবে নিশ্চয়ই বাংলার লোকসংস্কৃতি অনুরাগী ও গবেষকবৃন্দ তাঁর লেখনী থেকে এ জাতীয় কোন তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ পেতে পারত। যেমন ইতিপূর্বে রূপকথা, ছড়া, কবিসঙ্গীত সম্বন্ধে পেয়েছে।

কিন্তু লোকচিত্রকলার এই বিশিষ্ট অংকন-শৈলী যে পরে অন্য ভাবে তাঁর অন্তরে কাজ করেছে—এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা হবে।

দীঘল পট চিত্রের সঙ্গে তাঁর কাব্যের তুলনা প্রসঙ্গে আমাদের আবাল্য পরিচিত তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হতে পারে। সেটি হল তাঁর 'নদী' (১৮৯৬)—পরবর্তী কালে যা 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের (১৯০৯) অন্তর্ভুক্ত হয়, সম্প্রতি আবার পৃথকভাবে সচিত্র রূপে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

কবিতাটি একটি দীর্ঘ চিত্র—নদীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্মত বর্ণনা যার মূল বিষয়-বস্তু। অসংখ্য চিত্রের সমাবেশে এটি গঠিত। সেই চিত্রগুলির স্বরূপ উপলব্ধির জন্য এই কব্যের বিভিন্ন ছত্রের উধৃতি ছাড়াও এর সচিত্র সংস্করণটি বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। যে কোন পটুয়া এটি ইচ্ছা করলে পটে রূপান্তরিত করতে পারেন—অন্ততঃ অবনীন্দ্রনাথ যদি সে চেষ্টা নিতেন তো সফল হতেনই। গ্রন্থের চিত্রায়ণ দেখে এ মন্তব্য করতে পারা যায়। এই সংস্করণটি অলংকৃত হয়েছে প্রধানতঃ অবনীন্দ্রনাথের দ্বারা।

কিন্তু দীঘল পটের একটি অসুবিধা হল তার মধ্যে গতিময়তা নেই। অথচ

'নদী' কবিতার বিষয়-বস্তু ভীষণ রকম গতিময়—নদী-জীবনের প্রবহমানতাই তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

তাহলে কি এটা চলচ্চিত্র? উদার অর্থে বিচার করলে তা বোধ হয় বলা যেতে পারে।

দুই

সুতরাং পরিণত বয়সী রবীন্দ্রনাথের দু'টি বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচিত হতে পারে—লোকসাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ এবং চিত্রকলা অংকন প্রচেষ্টা। প্রথমটি তাঁর বিভিন্ন ছড়া লেখার মধ্য দিয়ে আংশিক প্রকাশিত। দ্বিতীয়টি পূর্ণ মাত্রায় চর্চার দ্বারা পূর্ণ রূপে প্রকাশিত।

ছড়া প্রসঙ্গে যে জড়ানো পটের কথা বলা হল, সেটি চিত্রকলার একটি অঙ্গ—শুদ্ধভাবে বলতে গেলে তা হল লোকচিত্রকলা।

'ঘটনার যোগাযোগে' অথবা এক্ষেত্রে যে শব্দই প্রযোগ করা হোক না কেন, তাঁর জীবনের শেষ বয়সে লোকসাহিত্যে ও চিত্রাংকনে অনুরাগ—এ সত্যটি বিশেষ ভাবে তাৎপর্য পূর্ণ। ক্রমাগতই তাঁর জীবনদর্শন বা কাব্যচিন্তা লৌকিক জীবনের নিকটে চলে আসছে—এটা কি তারই ইঙ্গিত! জীবনের সহজ সবল দিকটি রূপায়ণের জন্য তাই তিনি বেছে নিয়েছেন অনুরূপ একটি মাধ্যম।

তাঁর সাহিত্য-কর্মের সঙ্গে চিত্র-কর্মের এই মেল-বন্ধন সম্বন্ধে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন:

'এ কথা সত্য যে পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ রূপ-সৌন্দর্যকে প্রত্যাখ্যান না করেও রূপাতীত সৌন্দর্যের পিয়াসী হয়েছিলেন। এক দিকে যেমন তার প্রমাণ পাই তার ছন্দোগন্ধি গদ্য কবিতায়, তেমনি অপরদিকে এর প্রমাণ রয়েছে তার রূপগন্ধি চিত্রশিল্পে। অতি নিরূপিত ছন্দবন্ধনহীন গদ্য কবিতা এবং অতি নিয়ন্ত্রিত রূপলেখাহীন চিত্রশিল্প রচনায় যে তিনি প্রায় একই কালে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এটা আকস্মিক নয়। তাঁর অন্তর্নিহিত রূপাতীত সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রয়াস আত্মপ্রকাশ করেছে এই উভয় ক্ষেত্রেই।'[৪]

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথও বলেছেন: 'তাঁর চিত্রকলার সৃষ্টি আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তুলনীয়। আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাসের মতই তাঁর তুলি বা কলমের মুখে বেরিয়ে আসছিল অজস্রধারে, যা সমস্ত জীবন ধরে তাঁর ভিতরে জমে

উঠেছিল। তাকে চেষ্টা করে রূপ সৃষ্টি করতে হয়নি। গদ্যে পদ্যে গানে অশেষ প্রকারে আপনাকে প্রকাশ করেও তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারলো না। তাই তার জন্য শেষ বয়সে তাঁকে আবার রঙ ও রেখার সহায়তা গ্রহণ করতে হোল।'[৫]

আধুনিক কালে তাঁর চিত্রকলার সমালোচনা হচ্ছে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিতে। অনুরূপভাবে সাহিত্যের পটভূমিতে তাঁর চিত্র-চর্চার রূপায়ণ। তাঁর সাহিত্য ও চিত্র-সৃষ্টি যে পরস্পরের পরিপূরক, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন এ' বিষয়ে মত পোষণ করেছেন। 'রবীন্দ্র চিত্রকলা—রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা' গ্রন্থে শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই বিষয়টিই অজস্র প্রামাণিক উদ্ধৃতি ও চিত্র সহযোগে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

তিনিও রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক চিত্রকর্মকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করার পক্ষপাতী। তার প্রথমটি হল ছড়া জাতীয় ছবি—ছবি রাজ্যের ছড়া এবং দ্বিতীয়টি হল ভাবপ্রধান ছবি। প্রথম শ্রেণীভুক্ত চিত্রগুলি তাই স্বভাবতই লোকসাহিত্যের সেই বিশেষ শাখার প্রসাদ-পুষ্ট—যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দীর্ঘদিন ধরে মৌখিক সাহিত্যরূপে এদেশে চলে আসছে। তাই তাদের রূপায়ণও হয়েছে কিছুটা ছড়াধর্মী।[৬]

চিত্র সৃষ্টির এই ছড়া-ধর্মীতা তাঁর মনের গহনে সুপ্ত এক অদ্ভুত শিল্পীকে প্রকাশ করেছে। যে শিল্পী প্রথা না মেনে, নিয়ম না মেনে ছড়ার মতই সহজঃ সরল ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। লোকশিল্পের তথা লোকচিত্রকলার রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতির সঙ্গেই এর বেশী সাজুয্য।

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি থেকে তাঁর কাব্যের ও চিত্রের সমন্বয় সাধনের কোন সুস্পষ্ট ইসারা পাওয়া না গেলেও এ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যা বলেছেন সেটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য হতে পারে।

ছবির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি 'ছবির অঙ্গ' প্রবন্ধে (১৯১৫) প্রথমে রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ নিয়ে শাস্ত্র-সম্মত বিশদ আলোচনা করেছেন—অবশ্যই শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রবন্ধের শেষাংশে এসে তিনি মন্তব্য করেছেন :

'এই ছবির ছয় অঙ্গের সঙ্গে কবিতার কিরূপ মিল আছে তাহা দেখাইলেই কথাটা বোঝা হয়তো সহজ হইবে।

'ছবির মূল উপাদান যেমন রেখা, তেমনি কবিতার মূল উপাদান হইল বাণী। সৈন্যদলের চালের মতো সেই বাণীর চালে একটা ওজন, একটা প্রমাণ আছে, তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্য।

'এই বাহিরের সঙ্গে ভিতরকে মিলাইতে হইবে। বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই, তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্য কবির কল্পনার সাদৃশ্য লাভ করিবে।

'বহিঃসাদৃশ্য, অর্থাৎ রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য, অর্থাৎ যেটাকে দেখা যায় সেইটাকে ঠিকঠাক করিয়া বর্ণনা করা কবিতার প্রধান জিনিস নহে। তাহা কবিতার লক্ষ্য নহে, উপলক্ষ্য মাত্র। এইজন্য বর্ণনা মাত্রই যে কবিতার পরিণাম, রসিকেরা তাহাকে উচুদরের কবিতা বলিয়া গণ্য করেন না। বাহিরকে ভিতরের করিয়া দেখা ও ভিতরকে বাহিরের রূপে ব্যক্ত করা—ইহাই কবিতা এবং সমস্ত আর্টেরই লক্ষ্য।[৭]

'ফাল্গুনী-ঘরে বাউল-শান্তিনিকেতন' পর্বে কবির মনে কাব্য ও ছবি সম্বন্ধে এই যে চিন্তার প্রকাশ, তার চরম স্ফুরণ ঘটল জীবনের পরিণতি কালে—যখন তিনি তাঁর চিত্রকলাকে সাহিত্য রচনার পরিপূরক বলে মনে করছেন এবং সাহিত্য সৃষ্টি অপেক্ষা চিত্র সৃষ্টিকেই বেশী প্রাধান্য দিচ্ছেন।

জীবনের সেই অন্তিম পর্বে এসে নিজের চিত্রকলা সম্বন্ধে তিনি বলছেন: 'আমার ছবি হচ্ছে রেখায় রচিত শ্লোক বা কবিতা। যদি দৈবক্রমে আমার ছবি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তবে তা শুধু এই জন্যে যে এর ভিতরে একটা কোনো রূপের ছন্দ প্রকাশ পেয়েছে। এইটেই চরম—এছাড়া তার অন্য কোনো অর্থ নেই। এ'সব কোনো ঘটনার বর্ণনাও নয় কিংবা কোনো ভাবাদর্শের ব্যাখ্যাও নয়—নিছক ছন্দের প্রকাশ।[৮]

প্যারিসে যখন তাঁর চিত্রের প্রথম প্রদর্শনী হয়, তখন সাধারণ্যে প্রচারের জন্য তিনি ভূমিকা রূপে যা বলেছিলেন—উধৃতিটি তারই অংশ। মূলে ইংরাজী ভাষায় রচিত একটু দীর্ঘ, সেটি বাংলা ভাষায় সুষ্ঠু অনুবাদ করেছেন, 'রবীন্দ্র-চিত্রকলা' গ্রন্থ রচয়িতা মনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয়।

তিন

চিত্রকলার প্রতি তাঁর এই অনুরাগ শুধু যে তাঁর আত্মস্বীকৃতি বা অজস্র চিত্র সম্ভারের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে এমন নয়। চিত্রকলা, চিত্রকর, চিত্রাংকন পদ্ধতি—ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বিভিন্ন সময়ে তাঁর গল্পে 'কবিতায়' গানে বার বার ফিরে ফিরে এসেছে।

ইতিপূর্বে অন্যত্র তাঁর 'সেঁজুতি' গ্রন্থের 'চলতি ছবি' ও 'চিত্র-বিচিত্র' গ্রন্থের 'চলচ্চিত্র' কবিতার নামোল্লেখ প্রসঙ্গে সেখানে কি ধরনের চিত্রময়তা প্রকাশিত হয়েছে—তা বলা হয়েছে। ছড়ার ক্ষেত্রে যে তার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে, এ কথাও এখানে স্মরণীয়।

'পরিশেষ' কাব্যের 'আলেখ্য' কবিতায় তিনি শুরুতেই লিখেছেন :

'তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়
লেখনীর নর্তন-লেখায়।
নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছি
নিখিলের কাছাকাছি, ...'

ঐ রেখার উল্লেখ আছে কবিতার অন্যত্র ও :

'অমূর্ত সাগরতীরে রেখার আলেখ্য-লোকে
আনিয়াছি তোকে।
ব্যথা কি কোথাও বাজে
মূর্তির মর্মর মাঝে।' এই সংশয় হতে ত্রাণ পাবার আগেই তাঁর মনে আসে অপর চিন্তা : 'সুষমার অন্যথায়
ছন্দ কি লজ্জিত হল অস্তিত্বের সত্য মর্যাদায়।' অবশ্য তাতেও তাঁর দুঃখ নেই। তিনি স্পষ্টই বলেন : 'যদিও তাই বা হয়
নাই ভয়,
প্রকাশের ভ্রম কোনো
চিরদিন রবে না কখনো।' শেষ পর্যন্ত এই ভাবেই নিজের অংকন-শৈলীকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। বাস্তবিকই তাঁর এই রেখা-ভিত্তিক চিত্রাংকন পদ্ধতি, তাঁর চিত্র-সৃষ্টির রসগ্রহণের পক্ষে কোনদিনই বাধা হয়ে ওঠেনি। চিত্র সমালোচক তার মধ্যে যথার্থই শিল্পের ছন্দ ও সুষমা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন।

নিজের সৃষ্টি পদ্ধতি সম্বন্ধে এই যে স্বীকৃতি অর্থাৎ তার রেখাধর্মীতা—এটাই কি তাঁর চিত্রকলার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য? বলিষ্ঠ রেখায় কতকগুলি ইঙ্গিতময় টান-টোন দিয়ে এক বিচিত্ররূপ সৃষ্টি—এটা বরাবরই তাঁর অভিপ্রেত। কেননা 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপি সংশোধনের সময়ে রেখাচিত্রের ধরণেই তাঁর চিত্র প্রতিভার প্রথম বিকাশ—এ কথা এখানে মনে রাখবেই হবে। আলোচ্য কবিতার জন্ম তার মাত্র সাত বৎসর পরে।

অবশ্য 'পূরবী' গ্রন্থের 'ছবি' নামাংকিত কবিতাটি (১৯২৪) সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের। এখানে নামকরণটি প্রতীক বা ব্যঞ্জনাধর্মী বলে স্বীকৃতি দিতে পারা যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনার সঙ্গে তার শান্ত সমাহিত কবি চেতনায় যখন জাগরণ জাগে : 'এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,

এমনি চঞ্চল মায়া

জীবন অম্বর তলে'—তখন তাঁর গভীর চিন্তাটি আলংকারিক অর্থে 'ছবি' হয়ে ওঠে—যে ছবি আলো আর ছায়ায় লেখা। কিন্তু রঙের আলো-ছায়া আর রেখার টান, এ দুটি এক জিনিস নয়। প্রথমটি জীবন চিত্রের উপায়, দ্বিতীয়টি বাস্তব চিত্রের উপকরণ মাত্র।

এরই প্রতিফলন আছে 'বীথিকা' কাব্যের 'ক্ষণিক' কবিতায়। ঐ গ্রন্থের 'ছবি' ও 'ছায়াছবি'—দুটি কবিতার শিরোনাম নিতান্তই 'পূরবী' কাব্যের 'ছবি' কবিতার সমতুল্য। আলোচ্য প্রসঙ্গে তার বিশেষ প্রত্যক্ষ তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু নিজের আঁকা চিত্র সম্বন্ধে শিশু মনোরঞ্জনের ছলে তিনি 'চিত্র-বিচিত্র'র 'ছবি আঁকিয়ে' কবিতায় যা' বলেছেন, এ' প্রসঙ্গে সেটি আলোচ্য হতে পারে। ছেঁড়া-খোঁড়া পুরানো খাতায় তিনি ছবি আঁকেন যখন যা মনে আসে। আজ কেউ তা' বুঝতে পারে না বলে, কবিকেই তাঁর সৃষ্টির ব্যাখ্যা করতে হয় :

'আমি বলি তারে, এই তো ভালুক,
এই দেখো কালো বাঁদরের মুখ,
এই দেখো লাল ঘোড়া—
রাজপুত্রুর কাল ভোর হলে
দণ্ডক বনে যাবেন যে চ'লে—
রথে হবে ওরে জোড়া।

যে ছবি সম্বন্ধে ক্ষণপূর্বেই বংকিম মামা অনুযোগ করেছিলেন 'কিছুই যায় না তো চেনা'—কবির ব্যাখ্যায় তাই যেন মূর্ত হয়ে ওঠে :

'উঁচু হয়ে আছে এই যে পাহাড়
খোঁচা খোঁচা গায়ে ওঠে বাঁশ-ঝাড়,
হেথা সিংহের বাসা।
এঁকে বেঁকে দেখো এই নদী চলে,
নৌকো এঁকেছি ভেসে যায় জলে,
ডাঙা দিয়ে যায় চাষা।'

ভাবতে অবাক লাগে যে, যা যা চিত্রে নেই বা অপরের দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, যা নিতান্ত কল্পনার (!) বস্তু—তা তিনি কথা দিয়ে দর্শককে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। যেমন বাংলার পটুয়ারা তাদের ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে গান করে যায়, গানের মধ্য দিয়ে গল্প করে যায়। বিশদ গান আর সংক্ষিপ্ত ছবি দিয়ে সে তার গল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। গানগুলি যদি অবিকল চিত্রগুলিকে অনুসরণ করে চলত, তবে শ্রোতার কাছে গল্পের আকর্ষণ থাকত না। এই দুইয়ে মিলে হল পটচিত্রের পাঁচালী।[৯]

আলোচ্য 'চিত্র-বিচিত্র' কাব্যের প্রকাশ কাল ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ হলেও এর রচনা হল 'সহজ পাঠ' (১৯২৯) এর সমকালে। 'পরিশেষে'র 'আলেখ্য' কবিতা তার কিছু পরে—১৯৩২-এ। তাঁর চিত্রকলার লৌকিক রীতি-নীতি সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি যথাসময়ে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে।

এই প্রসঙ্গে তাঁর 'ছড়ার ছবি' কাব্যের 'ছবি আঁকিয়ে' (রচনা ১৯৩৭) কবিতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কাব্যের প্রতিটি কবিতা শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের অংকিত চিত্রের প্রেরণায় রচিত। তাই কবিতার সুরুতেই তিনি বলেছেন :

'ছবি আঁকার মানুষ ওগো পথিক চিরকেলে,
চলছ তুমি আশে পাশে দৃষ্টির জাল ফেলে।'

লক্ষ্যণীয় যে, এখানে চিত্রকর হল পথিক এবং সে ছবি আঁকে দৃষ্টি দিয়ে। কিন্তু তার ছবি আঁকার পদ্ধতি অন্যান্য চিত্রকরের মতই প্রথাগত এবং তার বিষয়-বস্তুতে কোন বাছ-বিচার নেই :

'পথ-চলা সেই দেখাগুলো লাইন দিয়ে এঁকে
পাঠিয়ে দিলে দেশ-বিদেশের থেকে।
যাহা যাহা যেমন তেমন আছে কতই কী যে,
তোমার চোখে ভেদ ঘটে নাই, চণ্ডালে আর দ্বিজে।'

তিনি নিজেও যেমন লাইন দিয়ে ছবি এঁকেছেন অজস্র, তাঁর সৃষ্ট চরিত্র,—সে-ও ঐ ভাবেই এঁকেছে তার ছবি। তবে তা নিজের খেয়ালীপনার মত, এই পথিক চিত্রকরও আঁকে :

'ওগো চিত্রী, এবার তোমার কেমন খেয়াল এ যে,
এঁকে বসলে ছাগল একটা উচ্চৈঃশ্রবা ত্যেজে।'

স্পষ্টতই এই বিস্ফুট প্রতীতি রবীন্দ্র-খেয়াল অংকিত চিত্রের স্বরূপ। আর কোনো চিত্রে রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-স্বভাব এত সহজ প্রকাশ হয়নি।

চার

চিত্রকর সম্বন্ধে তাঁর যে মনোভাব এবং তা 'চিত্র-বিচিত্রে'র 'ছবি আঁকিয়ে' কবিতায় যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা নেহাৎই এক লৌকিক রীতি-নীতির পট-আঁকিয়ের মত। এই পটুয়ারা তাঁর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল আরো অনেক আগে—সেই 'ঋণশোধ মুক্তধারা লিপিকা-বসন্ত' (১৯২০-২৩) ইত্যাদি রচনার যুগে। তাই লিপিকা গ্রন্থে 'পট' নামেই একটি গল্প আবির্ভূত হয়েছে :

'যে শহরে অভিরাম দেব-দেবীর পট আঁকে, সেখানে কারো কাছে তার পূর্ব পরিচয় নেই। সবাই জানে সে বিদেশী। পট আঁকা তার চিরদিনের ব্যবসা।' এই ভাবেই শুরু হয়েছে সেই গল্প।

একটি পটুয়াকে কি ভাবে তিনি তাঁর চিন্তায়-ধ্যানে মিশিয়ে নিয়েছেন, এই রূপক-কাহিনীতে তার সুন্দর নিদর্শন আছে।

"যে ঘরে অভিরাম পট আঁকে, সেই তার ঠাকুরঘর ; সেখানে গিয়ে হাত জোড় করে বললে, 'এই জন্যেই কি এতকাল রেখায় রেখায় রঙে রঙে তোমাকে স্মরণ করে এলেম'।"

জানিনা, তিনি বাস্তবে কখনও কোন পটুয়ার ঘরে গিয়েছিলেন কিনা,—অথবা এ'সব চিন্তা একান্তই তাঁর কল্পনাপ্রসূত। পড়ে কিন্তু মনে হয়—হয়তো এমনটাই হয়। তারপরে আছে মেলায় পট বিক্রীর প্রসঙ্গ—

"সেদিন নানা দেশের নানা লোক তার পট কিনতে এল, সেই ভীড়ের মধ্যে এল একটি ছেলে, তার আগে পিছে লোক-লসকর।

সে একটি পট বেছে নিয়ে বললে, 'আমি কিনব'।

অভিরাম তার নফরকে জিজ্ঞাস করলে, 'ছেলেটি কে।'

সে বললে, 'আমাদের রাজমন্ত্রীর একমাত্র ছেলে।'

অভিরাম তার পটের উপর কাপড় চাপা দিয়ে বললে, 'বেচব না'।" কি নিখুঁত পটুয়ার মানস-পটের চিত্রায়ণ। যে শিল্পী-মন নিয়ে তিনি ছবি এঁকেছেন, এ যে তারই প্রকাশ। তাঁর গল্পের পটুয়ার এই মেজাজের সঙ্গে তাঁর নিজের মেজাজটা একবার মিলিয়ে নিতে পারা যায়:

'আজকাল একেবারে অরুচি ধরেছে লেখায়। মনটা এখন স্বভাবতঃ ছোটে ছবির দিকে। লেখায় খাটাতে হয় কর্তব্য-বুদ্ধিকে। সে সব লেখা বোঝা-টানা লেখা। তার চাল দুরস্ত করবার কর্তব্য শেষ করেছি। তার আড়ষ্ট ভাব গেছে। সে নানা দিকে নানা ভঙ্গিতে হাত-পা খেলাতে পারে। তাই এখন আমার কলাচর্চার সখটা ছুটছে ছবির দিকে।'[১০]

সব বিদ্যাচর্চার একজন নির্দিষ্ট দেবতা আছে। পট চিত্রচর্চার দেবতা কে— তা পটুয়া জানে না। কাকে যে পূজা দিতে হয়, তা তো কোন শাস্ত্রে লেখে না। তাই কবি ঐ গল্পে লিখেছেন:

'প্রতিদিন প্রথম সকালেই অভিরাম তার ইষ্টদেবতার একখানি করে ছবি আঁকে। এই তার পূজা, আর কোনো পূজা সে জানে না।'

আর এক লোকশিল্পীকে তিনি অনেক মমতায় চিত্রিত করেছেন 'লিপিকা' গ্রন্থের 'ভুল-স্বর্গ' গল্পে। লোকটির পরিচয়—সে বেকার। কিন্তু তার নানা ধরনের সখ ছিল, যাকে সবাই বলত পাগলামি:

'ছোটো ছোটো কাঠের চৌকোয় মাটি ঢেলে তার উপরে সে ছোটো ছোটো ঝিনুক সাজাত। দূর থেকে দেখে মনে হত যেন একটা এলোমেলো ছবি, তার মধ্যে পাখির ঝাঁক; কিম্বা এবড়ো-খেবড়ো মাঠ, সেখানে গোরু চরছে, কিংবা উঁচু-নীচু পাহাড়, তার গা দিয়ে ওটা বুঝি ঝরনা হবে; কিংবা পায়ে-চলা পথ।'

লক্ষ্যনীয় এই যে, তাঁর 'এলোমেলো' ছবির এই ব্যাখ্যা কবি নিজেই দিয়েছেন এবং এখানেও সেই 'চিত্র-বিচিত্র' কাব্যের 'ছবি আঁকিয়ে'র প্রসঙ্গ এসে

যায়। যা' নেই তাকেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন মানস নেত্রে। তাই সেই ছবির বিষয়-বস্তু পাখির ঝাঁক বা এবড়ো-খেবড়ো মাঠ বা উঁচু-নীচু পাহাড় বা যা হোক কিছু হতে পারে।

লোকশিল্পের এই বিশেষ ধারাটি সম্ভবতঃ তাঁর বেশ প্রিয় ছিল—তাই নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধেও তিনি এই মনোভাব পোষণ করতেন।

সেই লোকটিকে যখন ভুল করে স্বর্গে আনা হল, তখন সে মনের মত কাজ খুঁজে পায় না। অগত্যা জল-আনতে-যাওয়া একটি মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হতে সে তার হাতের ঘড়াটি পেতে চাইল। মেয়েটি ভাবল, সে বুঝি ওকে জল ভরে এনে দেবে ঘড়ায়। কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুনল :

'তোমার কাঁখের একটি ঘড়া দাও, তাতে চিত্র করব।

হার মানতে হল, ঘড়া দিলে।

সেইটিকে ঘিরে ঘিরে বেকার আঁকতে লাগল কত রঙের পাক, কত রেখার ঘের।

আঁকা শেষ হলে ঘড়া তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। ভুরু বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এর মানে ?'

বেকার লোকটি বললে, 'এর কোনো মানে নেই।'

ঘড়া নিয়ে মেয়েটি বাড়ি গেল।

সবার চোখের আড়ালে বসে সেটিকে সে নানা আলোতে নানা রকমে হেলিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। রাতে থেকে থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে দীপ জ্বেলে চুপ করে বসে সেই চিত্রটা দেখতে লাগল।'

এর পরের ঘটনা আরো বিচিত্র। স্বর্গে নানা কাজে গোলমাল হতে লাগল। নানাবিধ 'মানে নেই' কাজে লোকেরা মেতে উঠল। তখন :

"সভাপতি তাকে বললে, 'তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে।'

সে তার রঙের ঝুলি আর তুলি কোমরে বেঁধে হাঁফ ছেড়ে বললে, 'তবে চললুম।'

বাস্তবিকই, পটুয়ার স্থান নেই কোথাও—স্বর্গে তো নেই-ই, এমন কি মর্ত্যেও যে বিশেষ নেই তা বোধহয় কবি ক্রমেই বুঝতে পারছিলেন। তাই অসীম-

মমতায় পরোক্ষ নিজেকেই প্রকাশ করেছেন পটুয়ার গল্পের ছলে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'পট' ও 'ভুল-স্বর্গের' নায়ক যেন রবীন্দ্রনাথেরই সুপ্ত মনের এক লোকশিল্পীর প্রকাশ।

কিন্তু 'চুনিলালে'র যে দুর্গতি তিনি এঁকেছেন 'চিত্রকর' গল্পে, তা-ও বোধহয় এর সমতুল্য বলে বিবেচিত হবে। এ কথা ঠিক, এই শিশুটির অংকন প্রতিভায় : 'যে সব জন্তুর মূর্তি হত, বিধাতা এখনও তাদের সৃষ্টি করেননি—বেড়ালের ছাঁচের সঙ্গে কুকুরের ছাঁচ যেত মিলে। এমন কি মাছের সঙ্গে পাখির প্রভেদ ধরা কঠিন হত।'

উল্লেখ্য যে, চুনিলালের সৃষ্ট চিত্রকলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ ঐ চরিত্রের স্রষ্টা যে সব মন্তব্য করেছেন—পরবর্তী কালে ঠিক ঐ সব শব্দই কিন্তু তাঁর সৃষ্ট চিত্রকলা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়।

তার চিত্রসৃষ্টির একটা বিরাট অংশ নিয়োজিত হয়েছে অদ্ভুত-রসের সাধনায়। এর মধ্যে কতকগুলি প্রাগৈতিহাসিক জন্তু জানোয়ারের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য-যুক্ত। বাকীগুলি তাঁর খামখেয়ালী মনের সৃষ্টি—যেমন-খুশি কলম চালিয়ে তিনি যেমন খুশি আকৃতি গড়ে তুলেছেন। তেমন আকৃতি হয়তো প্রকৃতির রাজ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সব অদ্ভুত-দর্শন কিম্ভূতকিমাকার জন্তুর ছবি তাঁর অহেতুক আনন্দের কৌতুককর খেলা—তাঁর অফুরন্ত সৃষ্টি-প্রতিভার খামখেয়ালী সৃষ্টি।[১১]

এ মন্তব্য ১৯৪৯ সালের। আর 'চিত্রকর' গল্পের প্রকাশ কাল হল ১৯২৯ সাল—প্রবাসীর কার্ত্তিক সংখ্যায়। 'পূরবী' গ্রন্থে পাণ্ডুলিপি সংশোধনের মাধ্যমেই যদি তাঁর চিত্রাংকন প্রতিভার প্রকাশ সুরু হয়—এ তবে তার কিছু পরে রচিত। প্রথাগত চিত্রশিল্পীর সত্ত্বা তাই গল্পে প্রকাশিত হচ্ছে একটু একটু করে।

শান্তিনিকেতনে সেদিন 'বর্ষামঙ্গল' উপলক্ষে কবি এ' গল্পটি রচনা করে সর্বসমক্ষে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন, সেদিন কি অবচেতন মনেও ভাবতে পেরেছিলেন যে এই চিত্রকর প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথ নিজেই![১২]

তাহলে প্রশ্ন জাগে, শিশু চুনিলাল কে? বাহ্যতঃ সে প্রতিপত্তিশালী গোবিন্দ বাবুর বিধবা ভ্রাতৃবধূ সত্যবতীর পুত্র হতে পারে। আসলে সে বোধহয় রবীন্দ্র-নাথেরই অন্তরের সামগ্রী। শুধু তাই নয়, চুনিলালের শিল্পী মেজাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্যত্র আরো আছে,:

'আজ চুনিবাবু নৌকো-ভাসানোর ছবি আঁকতে লেগেছেন। নদীর ঢেউগুলো মকরের পাল। হাঁ করে নৌকোটাকে গিলতে চলেছে এমনিতরো ভাব ; আকাশের মেঘগুলোও যেন উপর থেকে চাদর উড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে—কিন্তু মকরগুলো সর্বসাধারণের মকর নয়, আর মেঘগুলোকে 'ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিবেশঃ' বললে অত্যুক্তি করা হবে।· ·চলল রচনা, আকাশের চিত্রীও যা-খুশি তাই করছেন. আর ঘরের মধ্যে ওই মস্ত চোখ-মেলা ছেলেটিও তথৈবচ।'

এই সব উধৃতির পর কে যে রবীন্দ্রনাথ আর কে যে চুনিলাল, তার পার্থক্য খুঁজে বের করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই চুনিলালই যে 'ছবি আঁকিয়ে' কবিতার বংকিমের ভাগ্নে নয়,—তাই বা হলফ করে বলি কি করে।

পাঁচ

পাণ্ডুলিপি সংশোধনজনিত চিত্রকর্ম ছাড়া, জীবনের শেষ সৃষ্টি পর্বে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে অজস্র চিত্র সৃষ্টি করেছেন, সেগুলিকে বিশেষজ্ঞরা প্রধান তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক দৃশ্য ও গাছপালা লতাপাতার দৃশ্য, দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রতিকৃতি ও শেষতঃ জীবজন্তুর ছবি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণের চিত্রসৃষ্টি সম্বন্ধেই শিল্পরসিকরা বারে বারে তাঁকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্থচ্ছেদ করেছেন।

প্রথম প্রকাশ যেহেতু চেনা-জানার জগৎ, তাই সেখানে কবি কিছুটা বাস্তবানুগ, যদিও বর্ণবিন্যাসের রীতি-নীতি নিয়ে শিল্পরসিকরা তর্ক তুলতে পারেন। প্রায় সময়েই এগুলি তার কবিতার পরিপূরক হয়ে উঠেছে। মনো-জগৎ ও বাস্তব-জগতের বিচিত্র রূপ চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্রের মতই বেরিয়ে এসেছে তাঁর অন্ধকার মানস-গুহা থেকে। কোনোটি বা স্বপ্নময় জগতের কোনটি বা উল্কার মত দুরন্ত গতি সম্পন্ন আবেগময়তায় জড়িত। এগুলি যেন একাধারে তার শিশুমনের খেলনার মত, অপর পক্ষে প্রবীণের বলি-রেখাঙ্কিত মুখ।[১৩]

এগুলো নিয়ে তেমন চিন্তা নয়—চিন্তা হ'ল দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণ-ভুক্ত চিত্র নিয়ে। মানুষের প্রতিকৃতি আঁকতে গিয়ে যে ভাবে তিনি আমাদের কাছে বিশিষ্ট হয়ে আছেন, তা হ'ল : এগুলি কখনও বাস্তব চিত্র, কখনও বা ভীষণ-মূর্তি। আবার আলংকারিক অঙ্গ-সৌকর্যের সঙ্গে জ্যামিতিক আকারের মুখচিত্রও আছে। পোর্ট্রেট জাতীয় চিত্র যেমন এঁকেছেন তেমনি স্ব-প্রতিকৃতি অংকনেও

তাঁর অনীহা নেই। তেমনি, নাটকীয় ধরনের চিত্রের পাশাপাশি এঁকেছেন মুখোশ ধরণের চিত্র।

প্রাণী জগতের একদিকে যেমন মানুষ নামক জন্তু, অপর দিকে তেমন মানবেতর প্রাণী। মানুষ তাঁকে যেভাবে চিন্তান্বিত করেছে, মানবেতর প্রাণীরাও তাঁর চিত্রকলাকে সেভাবে সমৃদ্ধ করেছে। মানুষগুলো যেমন সত্যকার সীমানা ডিঙ্গিয়ে অসত্যের জগতে উঁকি দিয়েছে, মানবেতর প্রাণীরাও তদ্রূপ—মনে হয় মানব ও মানবেতর প্রাণীদের ভিতরের রসটা পরস্পরের পরিপূরক। খুব সরল ভাবে দেখলে মনে হবে, এগুলি কখনো বাস্তব কখনও বা আলংকারিক, আবার কখনও বা কিঞ্চিৎ অদ্ভুতও বটে।

কোন ধরা-বাঁধা পদ্ধতিই তিনি অনুসরণ করেননি—বা তিনি নিজে কোন পদ্ধতিও গড়ে তোলেন নি। একক ভাবে সুরু করে আঁকতে আঁকতে চলে গেছেন অন্য দিকে। উদার ভাবে বিচার করলে তাঁর চিত্রকলা হয়তো অনেকগুলো পদ্ধতির ধার-পাশ দিয়ে যায়, কিন্তু সঠিক ভাবে কোনটির মধ্যেই বাঁধা পড়ে না। সম্ভবতঃ ছবি আঁকার ব্যাপারে যেটা তাঁকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করত—সেটা হল তাঁর অবচেতন মন।[১৪]

মনোরঞ্জন গুপ্ত তাঁর চিত্রকলায় একটা আদিমতার কথা বলেছেন। আদিম যুগের চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির একটা সাদৃশ্য আছে—এই হল তাঁর মত। কিন্তু আধুনিক চিত্র-সমালোচক তাঁর চিত্রকলা সম্বন্ধে বলেন যে, আদিম শিল্পকলার সঙ্গে মিল থাকলেও এবং সেখান থেকে রস গ্রহণ করে থাকলেও রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোন সমকালীন শিল্পীর কাজের সঙ্গে দল বা গোষ্ঠীর আচার বা নিত্যকর্ম পদ্ধতির কোনো সম্পর্ক নেই। সমালোচকের মতেঃ 'পুরো এবং আধা মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে

রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে পাগল, শিশু এবং লোক-শিল্পীর কাজের তুলনা করার রেওয়াজ তৈরী হয়েছে এবং অশিক্ষিত দক্ষ শিল্পীদের কথাও কেউ কেউ তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ সুশিক্ষিত শিল্পী বলেই তাঁর ছবির সঙ্গে এইসব অশিল্পী এবং লোকশিল্পীর অভি-ব্যক্তির অন্ততঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাদৃশ্য খুঁজে বার করা যায়।' এই মন্তব্যের আপাত-বিরোধী ভাবটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও সমালোচক শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করতে পেরেছেন।[১৫]

পিকাসোর চিত্রাংকন পদ্ধতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শিল্প-সমালোচকগণ যা' বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তার কোন কোনটি যেন বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পিকাসোর মত তিনিও বিষয়কে খণ্ড করে দেখেছেন এবং তাঁর অনুভূতি তাঁকে যে ভাবে নাড়া দিয়েছে, টুকরো টুকরো তাকে সেভাবে সাজিয়েছেন। অদ্ভুতত্বের প্রতি তাঁর যে প্রগাঢ় নৈকট্য, হয়তো তা' বাস্তবকে বুঝতে না পেরে অন্তর্মুখী হবার চেষ্টা মাত্র। .

তাই তার চিত্রাংকনে কঠিন আপাত দুর্বোধ্য বিষয় প্রথমে হয়েছে বিকৃত বা distorted, তারপরে এসেছে বিমূর্ততা বা abstract ভাব। কখনও বা সেখানেও স্বস্তি না পেয়ে আশ্রয় নিয়েছেন ফ্যাণ্টাসির জগতে—তবে অ্যাবসর্ড-এর জগতে তাঁকে ততটা সরাসরি দেখা যায়নি।

আধুনিক শিল্পধারা আজ কত শাখায় প্রবাহিত হচ্ছে—কিউবিজম্, ফিউবিজম্, ডাডাইজম্, ফিউচারিজম্ ভার্টিসিজম্, সুররিয়ালিজম্, সিনক্রোনিজম্ এবং আরো কত।[১৬]

আত্মপ্রকাশের জন্যই একের পর এক মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে। শিল্পী কোন মাধ্যমেই তৃপ্ত হচ্ছেন না।

রাগ-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যেমন কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে—কোন না কোন রাগের আশ্রয়ে সেই সুরকে গড়ে উঠতেই হবে—রবীন্দ্র চিত্রকলার ক্ষেত্রে, চিত্র রচনার পদ্ধতিগত ব্যাকরণ তার বিপরীত ভাবে ঠিক তেমন ভাবেই হার মেনেছে।

তাই নানা সময়ে তার চিত্রের বিশ্লেষণ নিয়ে নানা মন্তব্য শোনা যায়।

একদা প্রতিমা দেবী বিশ্বভারতী পত্রিকায় [১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা] এ' সম্বন্ধে বলেছিলেন: 'ভারতের শিল্পকলায় সমস্ত ধারা (ট্রাডিশন) উলটে-পালটে দিয়ে আর্টকে নব জন্মদান করে গেলেন। কোথায় গেল কাঙড়া, কোথায় বা মোগল আর অজন্তা—সব গেল গুলিয়ে। যে নতুন রূপ নিয়ে আর্ট দেখা দিল—সে আর কিছু, অন্য কিছু, যার সঙ্গে আমাদের নতুন পরিচয়ের পালা সবে সুরু হয়েছে।'

পঞ্চাশের দশকে মনীষী অধ্যাপক শ্রীশিবনারায়ণ রায় তাঁর চিত্রাংকন রীতির অস্বচ্ছতার কারণে তাঁকে যথেচ্ছ আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ' সম্পর্কে তিনি প্রবন্ধও লিখেছিলেন—'গ্যয়টে ও রবীন্দ্রনাথ' এবং 'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ'। তিনি তাঁর অতি বাস্তববাদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলিকে অব-

চেতন স্তরের জৈববৃত্তির আদিম, শ্বাসরোধী অথচ জীবন্ত প্রকাশ বলে বর্ণনা করে তাঁর শিল্পসত্তার মধ্যে স্ববিরোধীতাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট নির্মম ও আপোষহীন হয়ে উঠেছিলেন।

এই বিরোধী মন্তব্যের বিপরীতে মার্কসবাদী কবি বিষ্ণু দে-র মন্তব্য বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। এই কবির বক্তব্য ছিল যে ভাষাশিল্পী আর চিত্রশিল্পী এই বিপরীতধর্মী রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মানসের পরিচয়। ইতি-পূর্বে শিবনারায়ণ রায় মহাশয়ের মতবাদ অর্থাৎ রবীন্দ্র-চিত্রকলায় অবদমিত লিবিডো চিহ্ন বর্তমান—ঐ তথ্য তিনি সরাসরি নাকচ করে দেন।[১৭]

ছয়

যে পদ্ধতিতেই তিনি ছবি এঁকে থাকুন না কেন, বা সেটি যে কোন শ্রেণীভুক্তই হোক না কেন, বাংলার সরল সহজ লৌকিক পদ্ধতি যে সব সময়েই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, ঐ কথা বিস্মৃত হলে চলবে না।

এই প্রসঙ্গে, চিত্র রচনার বিষয়-বস্তু নির্বাচনে তাঁর পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তথ্য নিবেদন করা যাক। ১৯৩১ সালে কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে তাঁর চিত্রকলার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন কবি-শিষ্য মুকুল দে এবং সেখানে প্রদর্শিত ২৬৫টি চিত্রের নাম ও দাম স্থির করেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ।

নানাবিধ বিষয়-বস্তুর মধ্যে যে কটি বিষয় দর্শক বারে বারে সেই প্রদর্শনীতে দেখেছিলেন—তা' হল, কবির নিসর্গ-প্রীতি, পুরাণ প্রীতি, লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি প্রীতি। এ' ছাড়া বিশেষ আকর্ষণ ছিল মুখাকৃতি অংকনের প্রতি ও নিজের সাহিত্যভিত্তিক চিত্র। নিছক নিসর্গ দৃশ্য বলতে যা' বোঝায় তা' এই প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত হয়েছিল অন্ততঃ পক্ষে ২৪ টা। পুরাণ, সাহিত্য ও মুখাকৃতি বিষয়ক চিত্র ছিল যথাক্রমে ১২, ৬ ও ১২ টা। আশ্চর্য এই যে, এই প্রদর্শনীতে তাঁর রূপকথা ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক চিত্র ছিল সংখ্যায় সর্বাধিক —প্রায় ২৮ টা।

এই আঠাশটি চিত্রের বিষয় বস্তু ছিল নিম্নরূপ : ড্রাগন, উপকথার কয়েকটি প্রাণী, কয়েকটি অতিপ্রাকৃতিক প্রাণী, ডাইনী, স্ফিংক্স, শয়তান, মহারাজ বিক্রমাদিত্য, আলিবাবার গল্পের বাবা মুস্তাফা, দস্যু সর্দার, আরব্যোপন্যাসের আবু হোসেন. কলা-বৌ, সুয়োরাণী-দুয়োরাণী, দৈত্য, বকের পিঠে ওড়া, কয়েকটি

মুখোস, রাজকন্যা ও রাজকুমার, রাজা-রাণী, আমীর, নাগ-নাগিনী, ব্যাঙ্গমা, মৎস্য-পক্ষী ইত্যাদি।[১৮]

তাঁর চিত্রাংকনের রীতি-নীতির সঙ্গে এই বিষয়গুলি এতই সংযুক্ত যে মনে হয়, অন্যান্য সকল বিষয় অপেক্ষা লোকশিল্পের রীতির সঙ্গে লোকসাহিত্যের বিষয়ের মেলবন্ধনটাই যেন এক্ষেত্রে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্রচারিত সচিত্র প্রচারপত্র থেকে উপরোক্ত তালিকা সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত হল। স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ কবি-শিল্পী মুকুল দে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাংকন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

··'তাঁর সহজ গতিশীল তুলি যে কোন কাগজের পাতেই অনায়াসে ছবি এঁকে তুলতে পারে। এমন কি, আর কিছু না পেলে খবরের কাগজে ছবি আঁকতেও তাঁর অরুচি নেই।'

এক ফরাসী সমালোচকের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল : 'রেখাগুলি বিশুদ্ধ দীর্ঘ, বক্র ভঙ্গিমায় প্রসারিত ; রেখাগুলি আশ্চর্য সৌষ্ঠবের সঙ্গে যাত্রা সুরু করে দীর্ঘায়িত ছন্দে সুপ্রসারিত।' তাঁর বর্ণ-নির্বাচন ও বর্ণ-নির্মাণ সম্বন্ধে তিনি জানিয়েছেন, 'তিনি তরল জল রং-এ জল রং ও জলে গোলা গঁদ ও মধু মিশ্রিত রং-এর ব্যবহার পছন্দ করতেন। কিন্তু প্যাস্টেল রং, রঙীন খড়ি. কালির ও ধাতুলিপি ব্যবহারের সূচীশিল্পেও তিনি নিপুণ ছিলেন। মাধ্যম হিসাবে তিনি বিভিন্ন বস্তুর ব্যবহার করেছেন···প্রায়ই তিনি কয়েকটি পুষ্পসার পছন্দ করতেন। মসৃণ ও উজ্জ্বল করবার মাধ্যম হিসেবে তিনি বিভিন্ন ধরণের তৈল বিশেষ করে নারিকেল ও সরিষার তৈল ব্যবহার করতেন।[১৯]

এ পদ্ধতি যে একান্ত ভাবেই দেশীয় পদ্ধতি এবং লোকচিত্রকলার বিশিষ্ট পদ্ধতি —এ' কথা সমালোচকরা স্বীকার করেছেন। ছবি আঁকার উপকরণ সম্বন্ধে দেশীয় প্রকরণের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ, তার জন্য অন্য রকম সিদ্ধান্ত গঠন করা যেতে পারে।

ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধে বিভিন্ন সময়ে তাঁর কবিতা ও গল্প হতে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর চিত্রকলার সঙ্গে পটচিত্রের একটি অদ্ভুত সাদৃশ্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টা হয়েছে।

লোকসাহিত্যের ভাষা যেমন বিশেষ রীতিধর্মী, শব্দ বা অলংকারের লেশহীন. সরল অথচ তার গতিবেগ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে চলেছে—তেমনি তাঁর চিত্রের ভাষা সরল অনাড়ম্বর। কিন্তু তার গতিবেগ যেমন, লক্ষ্যও তেমনি

নির্দিষ্ট। লোকসাহিত্যের ভাষা যেমন লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তার নানা দোষ ত্রুটি ধরা পড়ে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রের ভাষা যে পর্যন্ত লক্ষ্য স্থির রেখেছে, সে পর্যন্ত তা' ত্রুটিহীন মনে হয়, কিন্তু কিঞ্চিৎমাত্র লক্ষ্যচ্যুত হবার সম্ভাবনাতে দেখা দেয় নানা ত্রুটি।

রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্বন্ধে এই মূল্যবান মন্তব্যটি করেছেন রবীন্দ্র-শিষ্য শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। এই মন্তব্যের উৎস হল শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত রচিত 'রবীন্দ্র-চিত্রকলা' গ্রন্থের সমালোচনা।[২০]

বিনোদ বিহারী যে কথা বলতে গিয়েও স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি—তা হল, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা লোক-চিত্রের রীতি অনুযায়ী। তিনি তাকে লোক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অত্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে তুলনা করেছেন—কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনে দ্বিধা করেছেন বলে মনে হয়।

অথচ অন্যত্র তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর চিত্রকলার শ্রেণী বিচার প্রসঙ্গে বলেছেন যে —তা' স্যুরিয়ালিষ্ট চিত্র বলা যেতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে একটা মিল পাওয়া গেলেও, এই ধারার কোন বিশেষ লক্ষণ রবীন্দ্র চিত্রে প্রকাশিত হয়নি। য়ুরোপে যেভাবে এই ধারায় চিত্রশিল্পের বিশিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তা'তে শিল্পী তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকে সর্বপ্রথম নজর দিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ, সচেতন মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে একটি বিশেষ লক্ষ্য অভিমুখে চালিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় তিনি সে ধরণের কোন নির্দিষ্ট রূপায়ণ লক্ষ্য করেন না— যদিও তাঁর ছবিতে রিয়ালিজম্-এর সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। তাঁর আঙ্গিকে ও রূপের গঠনরীতিতে যে অদল-বদল ভাঙ্গচুর লক্ষ্য করা যায়—তার অন্তরালেও কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না। বরং এগুলি তার খেয়াল-খুশীর নামান্তর বলে মনে করা যেতে পারে।[২০ক]

তাঁর চিত্রসৃষ্টিকে সরাসরি লোকচিত্রকলা বা ঐ শ্রেণীর বলতে যথেষ্ট দ্বিধার কারণ থাকা স্বাভাবিক। কেন না, লোকচিত্রকলার যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজ পর্যন্ত তার প্রকৃতি নিরূপিত হয়েছে—সম্ভবতঃ তাঁর চিত্রকলা সে ধরণের নয়।

কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, লোকচিত্রকলার যা সূক্ষ্ম অর্থে পটচিত্র অংকনের সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এ যাবৎ যে সব তত্ত্ব নিরূপিত হয়েছে— তা কি খুবই অপরিবর্তনীয়? দেশভেদে, কালভেদে, পাত্রভেদে কি তার নিয়মের এতটুকু নড়-চড় হয় না?

রবীন্দ্র-প্রতিভা বিশ্লেষণের জন্য ইতিমধ্যে নানা জনে নানা ভাবে তত্ত্বকে ব্যতিক্রম করে গেছেন—সুতরাং তাঁর চিত্রসৃষ্টির উপযুক্ত সমালোচনার জন্য নতুন কোন যুক্তি গঠন করা নিতান্ত অযৌক্তিক না হতেও পারে। কেননা প্রচলিত কোন রীতি-নীতিতেই তাঁর কাব্য-উপন্যাস-গল্প-নাটককে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। তিনি বহু সময়েই তাঁর পূর্বসূরীদের সৃষ্টি বা প্রতিভা থেকে এত বেশী অগ্রসর যে, তাঁর জন্যই নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি করতে হয়েছে।

এ দেশীয় লোকচিত্রকলা বলতে প্রধানতঃ কালীঘাটের পট বা তজ্জাতীয় চিত্রকলাকেই আদর্শায়িত বলে মনে করা হয়। সেই নিরীখেই চব্বিশ পরগণার পট, মেদিনীপুরের পট, বীরভূমের পট বা মানভূমের পটের চিত্রাংকন পদ্ধতি ও নৈপুণ্যের বিশ্লেষণ হয়।

কালীঘাটের পট সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন শিল্পী কানাই সামন্ত তাঁর ঐ নামের প্রবন্ধে। তাছাড়া দেশী-বিদেশী বহু গবেষক এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। পটের অংকন রীতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে সকলেই প্রায় ঐক্যমত হতে পেরেছেন।[২১]

মনে রাখতে হবে যে, সমস্তই হল একটি বিশেষ স্থানের পট অংকন রীতি সম্বন্ধে আলোচনা। কারণ ঐ স্থানটি রাজধানী কলকাতার অংশ যা দেবমাহাত্ম্য বা অন্য কোন কারণে বরাবর সবার কাছে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। তুলনায় বাংলার অন্যান্য স্থানের পট-অংকন রীতির তেমন বিশেষ কোন প্রচার হতে পারেনি। তাদের অংকন-রীতির যে পৃথক কোন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না থাকা সম্ভব—সে সম্বন্ধেও সমালোচকগণকে তেমন অগ্রণী হতে দেখা যায় না। ফলতঃ পটের অংকন রীতির ব্যাপারে কালীঘাটের পটের রীতিই ক্রমে ক্রমে একটি আদর্শায়িত পদ্ধতি হয়ে জনমানসে ঠাঁই করে নিতে পেরেছে।

কিন্তু রাষ্ট্রনীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও আর্থিক জীবনের যে সম-পরিমাণ পরিবর্তন হয়—তার প্রভাব নিশ্চয়ই লোকচিত্র-শিল্পীকেও কিছুটা প্রভাবিত করে। কোন অংকন-রীতিই দীর্ঘকাল ধরে এই অনড় অচলায়তন রীতিতে বন্দী থাকতে পারে না।

একথা ঠিকই নগর-সংস্কৃতি যত দ্রুত এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করে নিতে পারে,

গ্রাম্য তথা লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যে সেই গ্রহণেচ্ছা তত দ্রুত ঘটে উঠে না। কিন্তু ধীর গতিতে হলেও সেখানেও যে চিন্তার পরিবর্তন আসে, তার পরিচয় লোকসাহিত্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়ানো আছে। লোকশিল্পীর কণ্ঠে সে পরিবর্তন গীত হয়। তাই ট্রাডিশনাল ও বর্তমান—এই উভয় প্রকরণই তাঁর কণ্ঠের গীতে ধ্বনিত হয়। লোকসংস্কৃতির অন্যান্য শাখা অপেক্ষা লোকগীতি ও লোকচিত্র-কলার ক্ষেত্রে ঐ মন্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

তাই বাংলার পাল রাজাদের সময়ের পুঁথিচিত্রে বা বহু-কথিত কালীঘাটের পটে কোন কোন চিত্র-সমালোচক অজন্তা রীতির মত পদক্ষেপ আবিষ্কার করতে পারেন সহজেই। প্রাচীন পুঁথিচিত্র বা কালীঘাট পট ছাড়াও, অনুরূপে ছবি আঁকবার রীতি-পদ্ধতি এ অঞ্চলে কোথাও কোথাও ছিল। ভারতের মুখ্য চিত্রাংকন রীতিগুলি বিশ্লেষণ করলে, বহু স্থলেই এই ধরণের মত মিশ্রণ রীতি লক্ষ্য করা যায়—যার কারণটা খুব উদারভাবে বলা চলে—ঐতিহাসিক।[২২]

পট অংকন রীতির এই ধীর-গতি পরিবর্তন, বিবর্তন, মিশ্রণ ইত্যাদি স্বীকার করে নিলে রবীন্দ্র-চিত্রকলার লৌকিক অংকন-রীতির স্বাতন্ত্র্যটা আরও সরল হয়ে আসে। এর সঙ্গে শহুরে চিত্রকলার কংক্রীট, অ্যাবস্ট্র্যাক্ট, অ্যাবর্সড ফ্যান্টাসি ইত্যাদি রীতিগুলি যোগ করলে, চিত্রাংকনের ক্ষেত্রে শহুরে ও গ্রাম্যরীতির মধ্যে মৌল সাদৃশ্য নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ থাকে না।

সাত

লোকশিল্প, লোকচিত্র, লোকসাহিত্য, লোকপ্রথা, লোকাচার ইত্যাদি শব্দগুলি প্রধানতঃ এক বিশেষ ধরণের সংস্কৃতির দ্যোতক, অর্থাৎ যে সংস্কৃতি প্রধানতঃ গ্রাম্য সমাজে পালিত ও পোষিত হয়ে আসছে। এই শব্দের প্রয়োগ ও ব্যাপ্তি তাই শহুরে হলেও, আধুনিককালে তা সীমিত হয়ে গেছে উপরোক্ত সংকীর্ণ নাগরিক অর্থে।

তাই শিল্প, চিত্র, সাহিত্য, প্রথা বা আচার বলতে বর্তমানে শহুরে সংস্কৃতির কথা বোঝানো হয়। সংস্কৃতি শব্দের এই প্রয়োগ ঠিক অথবা ভুল—যাই হোক না কেন, লোকশিল্পের ক্ষেত্রে কথাটি একটু বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়।

আলোচ্য প্রসঙ্গে লোকচিত্রকলা যদি মূলতঃ গ্রাম্য চিত্রাংকন-রীতি বলা হয়, তবে সেটা আরেক বিতর্কের বিষয় হবে। কেননা যে কালে কালীঘাটে

পটশিল্পের সূত্রপাত হয়, তখন কলকাতা যে আদিম গ্রাম্য পর্য্যায়ে ছিল—এ' কথা মনে করার কোন কারণ নেই। কালীঘাট তখন হয়তো এত সুসভ্য হয়ে ওঠেনি, তবে তীর্থক্ষেত্র রূপে তার প্রসিদ্ধি তারও পূর্বের।

সম্ভবতঃ সেই সূত্রেই একটি চিত্রকলা শিল্প হিসেবে এত বেশী-সংখ্যক লোকের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। নচেৎ অন্যান্য সুকুমার শিল্পের মত, সেটিও ইতিহাসের নিয়মেই লুপ্ত হয়ে যাবার কথা।

লোকচিত্রকলা চর্চার পক্ষে কোনটি বেশী প্রয়োজনীয়—বহিঃপরিবেশ অথবা অন্তঃপরিবেশ—সেটা বিচার্য হওয়া প্রয়োজন। শিল্পীর পক্ষে গ্রামে বসবাস করা একান্ত প্রয়োজন কি না—এটা নিয়েও বিশেষ দ্বন্দ্ব আছে। গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে থাকলে গ্রামীণ চিন্তা-ভাবনা রূপকলা সৃষ্টির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হতে পারে—কিন্তু সৃজনশীল স্রষ্টার কাছে সেটা নেহাৎই বাইরের ব্যাপার।

শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় এ কালের এক অগ্রগণ্য শিল্পী। তিনি আজীবন লোক-চিত্রের রীতিতে শিল্প-সাধনা করে গেলেন এবং প্রত্যক্ষভাবে দেশীয় চিত্র রচনার পদ্ধতিকে বিশ্বের দরবারে এক মহান আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। শহরেই তাঁর চিত্রকলা শিক্ষা। তবু, নিজের আত্মপ্রকাশের জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন নিজের বাল্যস্মৃতি-জড়িত সেই লোকচিত্র সমৃদ্ধ গ্রাম ও গ্রামীণ জীবন। প্রখ্যাত চিত্র সমালোচক ড. ষ্টেলা ক্রামরিশ তাঁর এই গ্রামে ফেরাকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন। তার মতে এটি হল যামিনী রায়ের 'সচেতন এবং উৎপাদনশীল গৃহ প্রত্যাবর্তন'। পরবর্তী কালে তাঁর এ' মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়।[২৩]

এ ক্ষেত্রে বাইরের পরিবেশ অপেক্ষা ভিতরের পরিবেশই যে যামিনী রায়কে লোকচিত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে—সে ব্যাপারে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাংকন রীতির মানস-পরিবেশ সম্বন্ধেও কি ঐ ধরণের কোন মনোভাব গ্রহণ করা বলে না?

শহুরে চিত্রশিল্পীর যে মন-মেজাজ, তা তাঁর একেবারেই ছিল না বললেই চলে। এ সম্বন্ধে প্রতিমা দেবী বলেছেন, এক এক সময় তাঁর তুলিতে বন্যার মত ছবি বেরিয়ে আসত। কখনও বা দৈনিক চার-পাঁচখানা পর্যন্ত হয়েছে। হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাতেই এঁকেছেন। রং-এর ব্যাপারেও বিশেষ পছন্দ-অপছন্দ ছিল না। কালি রং, যা হোক কিছু পেলেই হল। তাঁর আঁকার পদ্ধতি সম্পূর্ণ রূপে তাঁরই—স্বদেশী-বিদেশী কোন পদ্ধতিরই তিনি অনুকরণ করেন নি।[২৪]

তাঁর চিত্রাংকন পদ্ধতি ও বিষয়ের সঙ্গে তার শিল্পী মেজাজের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—তা' বিবৃত করেছেন রাণী চন্দ তাঁর 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। সেখান থেকে কয়েকটা উদ্ধৃতি দেওয়া হল, এগুলি সবই তাঁর খেয়ালীপনার উক্তিঃ

'আমার হচ্ছে—যা ইচ্ছে তাই। কাগজ রং নিয়ে যা মনে হোল, তাই আঁকলুম। মনের সঙ্গে রং তুলি নিয়ে খেলা খেললুম। সেই হচ্ছে আমার ছবি।'—১১-৭ ৩৯

'পেনসিলগুলো আমার পটপট করে ভেঙ্গে যায়। অবশ্যি আমি একটু চাপ দিয়েই আঁকি।—মনটা জোরে চলতে থাকে কিনা।'—১৩-৭ ৩৯

'আমি যা আঁকি, তা মনের অগোচরে। ইচ্ছা করে' আঁকা বা আঁকতে চাওয়া, তার একটা রূপ দেওয়া—তা আমার দ্বারা হয় না। হিজিবিজি কাটতে কাটতে একটা কিছু রূপ নিয়ে যায় আমার আঁকা। একে কি আর্টিস্ট বলে।—দেখো না কতগুলো মাথামুণ্ডই আঁকলুম। কোনোটার গোঁফ আছে, কোনোটার নেই. কোনোটা বেঁকে গেছে, কোনোটা অদ্ভুত—এর কি কোনো মানে আছে?'—২৪-৭-৩০

'দেখ তো অন্ধের মত বসে বসে এই ছবিগুলি করলুম। শুধু লাইনেই রেখে দিলুম। এইতেই যখন ছবি একটা কথা বলছে, তখন আর তাতে কিছু করা উচিত নয়।'—২৭-৭-৩৯

'ছবি আঁকার সব সাজ-সরঞ্জাম আমার হাতের কাছে না থাকলে আমার ছবি আঁকা হয় না। একটু তুলি, একটু কলম, কালি, রঙ সব মিশিয়ে বড়ো কাগজে ছবি আঁকতে পারলে, তবে কিছ একটা বিদঘুটে রকম করে এঁকে কিছু দাঁড করাতে পারি।'—১০-১-৪১

এই ভাবে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথের মেজাজী মনের পরিচয় দেয়া যায়—যেটা একেবারে কবির মত খেয়ালী আবার গ্রাম্যশিল্পীর মতই অনাড়ম্বর-সরল।

ঠিক এর পাশাপাশি যখন যামিনী রায়ের কথা আলোচনা করা হয়, তখন এঁদের দুজনের মধ্যে কার চিত্র কতটা সমধর্মী সেকথা সরল হয়। যামিনী রায় যখন ছবি সম্বন্ধে কথা বলেন, সে কথা এলোমেলো হয়—হয়তো স্পষ্ট করে মনের কথা বলতে পারেন না। কিন্তু এটাই সবচেয়ে ভালো লাগে যে, চিত্রকলার কোনো পরিভাষা তিনি একবারও ব্যবহার করেন না। একেবারে আটপৌরে

ঘরোয়া ভাষায় জ্ঞানের কথা বলেন তিনি। এতে এটা বোঝা যায় যে, দাবীর বিদ্যেটা সত্যই তাঁর দখলে। অতি দুরূহ, তাই অতি বিরল, এই সহজ স্বাচ্ছন্দ্য।[২৫]

এই ধরা-বাঁধা রীতির বাইরে যেতে চাওয়া থেকেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলাও এক বিশেষ দিকে ধাবিত হয়েছে—যাকে উৎস-বিচারে লোকশিল্পের নিকট আত্মীয় বলা যেতে পারে।

জীবনে তিনি যথার্থ পট বা পটুয়া হয়তো দেখেছিলেন বা হয়তো দেখেননি —সেটা বড় কথা নয়। ঠাকুর বাড়ীর ঐ বৈচিত্র্যময় বিশাল চৌহদ্দীর মধ্যেই তাঁর সে সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ সুযোগ হয়েছিল।

তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রী সুনয়নী দেবী—বিশদ পরিচয়ে যিনি অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্রের ভগিনী—তিনিও চিত্রকলার চর্চা করতেন। স্বামী-পুত্র নাতি-নাতিনীদের নিয়ে বিরাট সংসার। তবু তারই মধ্যে একটু সময় করে তিনি রং-তুলির চর্চা করেছেন। অন্তরের ভেতরের সুপ্ত ইচ্ছাকে তিনি এইভাবে ধীরে ধীরে আলোর দিকে এগিয়ে এনেছিলেন। একান্তই গৃহবধূ, বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়তো তত ছিল না। তাই চেনা-জানার জগৎকেই তিনি তার চিত্রাংকনের বিষয় করেছিলেন।

সম্ভবতঃ সেই কারণেই তার চিত্র রচনার মধ্যে কালীঘাটের পটুয়াদের অংকন রীতিটি বেশী ফুটে উঠেছে। ঐ পদ্ধতিতে তাঁর আঁকা 'রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি' রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও সংরক্ষিত আছে।

সম্প্রতি তাঁর চিত্রকলার যে প্রদর্শনী হয়ে গেল শহর কলকাতার এক গ্যালারীতে, সে সম্বন্ধে জনৈক চিত্র-সমালোচক কিন্তু ভিন্ন ধরনের মত পোষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য: 'সহজাত দক্ষ কিন্তু অশিক্ষিত পটু শিল্পী, তিনি ঠিক লোকশিল্পী নন। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পকলার মত লোকশিল্পেরও রীতি পরম্পরার বাঁধাবাঁধি কম নয়। কিন্তু সব দেশেই দেখা যায়, সহজিয়া শিল্পকলার সঙ্গে সেই দেশের প্রচলিত শিল্পকলার একটা সম্পর্ক আছে।'[২৬]

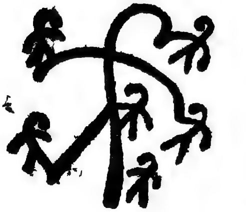

সমালোচকের এই মন্তব্য কিন্তু পরোক্ষে সুনয়নী দেবীর চিত্রকলার লৌকিক পদ্ধতিটা স্বীকার করেই নিয়েছে, যদিও সেটা তিনি বোধহয় সমালোচনার খাতিরে খুব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে চাননি।

তাই পারিবারিক পরিবেশেও তিনি ঐতিহ্যবাহী দেশীয় চিত্রাংকন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছেন। ঠাকুরবাড়ীতে সুনয়নী দেবীর যে পরিচয়, পরবর্তী কালে তা থেকেই যদি গল্পগুচ্ছের 'চিত্রকর' গল্পের 'সত্যবতীর' জন্ম হয়ে থাকে তবে সেটা নেহাৎ অসম্ভব নয়।

সুতরাং পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের মনে যদি চিত্র রচনার সময়ে পট-অংকন পদ্ধতির সরল অনাড়ম্বর রীতির প্রভাব থেকেই থাকে—তবে সেটা নিছক অন্যায় নয়। যদিও আপাত দৃষ্টিতে এ দুটির মধ্যে সাজুয্য অনুসন্ধান করা নিতান্তই পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। তবে ব্যতিক্রমী রীতি-নির্মাণে কবি তো বরাবরই অগ্রণী। নচেৎ বিনোদ বিহারীই বা তাঁর চিত্রাংকনকে লোকসাহিত্যের মত সরল বলেন কেন—আর কেনই বা তিনি তাঁর পরিণত বয়সের শিশুরঞ্জন গ্রন্থ 'সে'-কে অসংখ্য স্বঅংকিত চিত্রে ভূষিত করে তাকে এক দীঘল পটের রূপ দেন। তাই মনে হয়, এ গ্রন্থটি যেন চিত্রের ব্যাখ্যার জন্যই রচনা।

লোকসংস্কৃতির সকল ব্যাপারেই যাঁর প্রগাঢ় তৃষ্ণা, জীবনের শেষাংশে এসে তিনি নিজেই তার সামিল হলেন এবং অবচেতন মনের তাড়নায় চিত্রাংকন রীতির জন্য এমন এক লৌকিক রীতির আশ্রয় নিলেন—যা আজো লোকচিত্র-কলার রীতিনীতির ক্ষেত্রে এক, অনন্য ও অননুকরণীয় হয়ে রইল।

মানসিকতায় যিনি বাউলদের খুব নিকটবর্তী, কাহিনী রচনায় যিনি পট-পটুয়াদের কথা ভাবতে ভালবাসেন, ছেলে-ভুলানো-ছড়া সংগ্রহ যাঁর গভীর অনুরাগের, সঙ্গীত রচনায় যিনি লোকগীতির দ্বারা প্রভাবিত,—তাঁর চিত্রকলার বিষয়-বস্তু না হোক পদ্ধতিটা যে অন্ততঃ লোকজীবনের কোনো স্তর থেকে উঠে আসবে—এমন ধারণা করা বোধহয় নিতান্ত অসঙ্গত নয়। মহাভারত-রামায়ণ থেকে সুরু করে গেরস্থ-বধূর মুখ-চলতি ছড়াও যাঁর কলমে পড়ে নব ব্যাখ্যায় ও রসে আধুনিক হয়ে ওঠে, চিত্র রচনার একান্ত লৌকিক পদ্ধতিও যে তেমন ভাবেই তাঁর হাতে নবীকৃত হবে—এতে আশ্চর্য কিছু নেই। বরং বাংলার লোকচিত্র-কলাই এ জন্য তাঁকে চিরদিন এক অনন্য আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখবে।

তথ্যসূত্র :

১. লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১৬—২৩

২. ছড়া—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভূমিকা

৩. বিশ্বভারতী পত্রিকা। কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৩

৪. রবীন্দ্র চিত্রকলা—মনোরঞ্জন গুপ্ত। পৃঃ ৪৫

৫. বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি—অবনীন্দ্র সংখ্যা। ১৯৪২

৬. রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা—সরোজ মুখোপাধ্যায়। মহানগর, ডিসেম্বর '৮২

৭. বিচিত্র প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১২৯—১৩০

৮. Calcutta Municipal Gazette—Tagore Memorial Special Supplement, 1941

৯. বাংলার লোক সাহিত্য (১ম)—আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃঃ ২৩৬-২৩৭

১০. কবি সহচর অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র। ৮ শ্রাবণ, ১৩৩৯

১১. রবীন্দ্র চিত্রকলা—মনোরঞ্জন গুপ্ত। পৃঃ ৩৪

১২. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—প্রমথ নাথ বিশী। পরিশিষ্ট, পৃঃ ২৪ (পাদটীকা)

১৩. গুরুদেবের ছবি—প্রতিমা দেবী। বিশ্বভারতী পত্রিকা (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

১৪. রবীন্দ্র চিত্রকলা—মনোরঞ্জন গুপ্ত। পৃঃ ২৭

১৫. শেষ বয়সের প্রিয়া—সন্দীপ সরকার। দেশ ৭.৮.৮২

১৬. পিকাসোর শিল্প—সত্যব্রত রায়। পথিকৃৎ, অক্টোবর '৮২

১৭. 'প্রিয় সম্পাদক' (পত্র)—অমিয় কুমার বসু। আজকাল ১৫।১২।৮২

১৮. চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ—শিবনাথ সরকার। পৃঃ ১১৮-১২৯

১৯. চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ—জানিন ওবোরাইয়ের। উত্তরসূরী (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা) ১৩৬৭-৬৮, পৃঃ ২৩৪

২০. বিশ্বভারতী পত্রিকা। নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

২০ক. রবীন্দ্রনাথের ছবি। বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়। উত্তরসূরী (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা) ১৩৬৭-৬৮, পৃঃ ২২৯।

২১. চিত্রদর্শন—কানাই সামন্ত। পৃঃ ৮৭-৮৯

২২. ভারত চিত্রদর্শন : ভারতীয় চিত্রকলা—কানাই সামন্ত। চিত্রদর্শন পৃঃ ৬৩

২৩. Jamini Ray—Ajit Dutta (Lalit Kala Acadami) pp. 5

২৪. বিশ্বভারতী পত্রিকা—১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

২৫. সব পেয়েছির দেশে—বুদ্ধদেব বসু। পৃঃ ১২১-১২২

২৬. চিত্রকলা : সুনয়নী দেবী। সন্দীপ সরকার। দেশ ১৬.১০.৮২

সাহিত্যে লোকচিত্রকলা

এক

সমাজের যে অংশে সাহিত্য-স্রষ্টার অবস্থান—আধুনিককালে তা একান্তই শহুরে। শুধু তাই নয়, 'শহুরে' শব্দটাও সংস্কৃতির বিবর্তনের মাপকাঠিতে একান্তই নবীন। এমন এক সময় ছিল, যখন সকল সাংস্কৃতিক স্রষ্টাই ছিল সাধারণ সমাজে—সেই সমাজ না ছিল গ্রামীণ না ছিল শহুরে।

ফলতঃ, সাহিত্য যদি সমাজের দর্পণ হয়, তবে সচেতন সাহিত্য স্রষ্টা তার সামাজিক অবস্থান যে স্থানেই হোক না কেন—তিনি আপন সৃষ্টিতে নিজের চেতনাতেই তার সেই সমাজকে প্রকাশ করেন। সেই সমাজের রীতি নীতি, আচার-বিচার, শিল্প-সংস্কৃতি—সবই হয় তাঁর সাহিত্যের বিষয়।

যুগে যুগে এই ভাবেই লোকচিত্রকলাও তাই হয়ে এসেছে সাহিত্যের সঙ্গী। নিছক আরোপিত রূপে নয়, সাহিত্যিক প্রয়োজনেই তা' এসেছে সাহিত্যে। একদিকে তা' যেমন লিখিত সাহিত্যের রাজকীয় বিভব-মহিমায় ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে, অপর দিকে গ্রামীণ মৌখিক সাহিত্যের সরলতায় তা' হৃদয়ের আরো নিকটবর্তী হয়ে উঠেছে। এ' দু'য়ের মধ্যে কোনদিন কোন দ্বন্দ্ব হয় নি। জীবনের সকল সৃষ্টির মত চিত্রকলাও তাই হয়ে উঠেছে লিখিত ও মৌখিক সাহিত্যের এক অচ্ছেদ্য বিষয়-বস্তু।

তাই লোকচিত্রকলার যে সব নিদর্শন সুপ্রাচীন কাল থেকে সমাজে প্রচলিত, এতদিন ধরে আমাদের ঐতিহ্যবাহী লিখিত সাহিত্য সার্থক ভাবেই তার স্বাক্ষর বহন করে এসেছে।

একে ঠিক 'সাহিত্যে লোকচিত্রকলার প্রভাব'—বা এ' জাতীয় বাক্যবন্ধে নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়। পরিবর্তে, লোকচিত্রকলার মত আপাত সংক্ষিপ্ত জীবন-উপাদানও যে সাহিত্য-রসস্রষ্টার দৃষ্টির বাইরে যায় নি, বরঞ্চ ক্ষুদ্র হলেও আপন-সাহিত্যিক দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করে গেছে—এ কথাই ভাবা যেতে পারে।

অতি প্রাচীন কালের সংস্কৃত সাহিত্যের অনুপম গদ্যকাব্য হল 'কাদম্বরী'। কবি বাণভট্ট রচিত এই অমর গদ্যকাব্য সম্বন্ধে একদা রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন: 'সমস্ত কাদম্বরী কাব্য একটি চিত্রশালা।' কথাটি আক্ষরিক ভাবে সত্য হলেও, বাণভট্টের লেখনীতে 'চিত্রকলা' কিভাবে এখানে চিত্রায়িত হয়েছে, তার দু'একটা উদাহরণ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রাজমহিষী বিলাসবতী গর্ভবতী হলে মহারাজা তাকে দেখতে আসছেন। রাজমহিষী যেখানে অবস্থান করছেন, সে স্থানের বিবরণ:

'মহিষী গর্ভোচিত কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, ··শিরোভাগে মঙ্গল-কলস রহিয়াছে। চতুর্দিকে মণির প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং গৃহে শ্বেত-সর্ষপ বিকীর্ণ আছে।'

এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী প্রসঙ্গে বাণভট্টের নিখুঁত চিত্রময় বিবরণ হল:

'গণকেরা গণনা দ্বারা শুভ লগ্ন স্থির করিয়া দিলে নরপতি পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রীর সহিত গৃহে গমন করিলেন। দেখিলেন, সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে দুই পার্শ্বে সলিলপূর্ণ দুই মঙ্গল-কলস, স্তম্ভের উপরিভাগে বিচিত্র কুসুমে গ্রথিত মঙ্গল-মালা। পুরস্ত্রীবর্গ কেহ বা ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিতেছে, কেহ বা মাতৃকাগণের বিচিত্র মূর্তি চিত্রপটে লিখিতেছে।'

উধৃতাংশে, লোকচিত্রকলার দুটি প্রকরণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজভবনে মঙ্গল-কলস যে নানাবিধ আলপনায় চিত্রিত, এ' বিষয়ে নিঃসন্দেহ। মঙ্গল-কলস স্থাপনের ক্ষেত্রে এই প্রথা আজও প্রচলিত। দ্বিতীয়তঃ, পুরস্ত্রীগণ যে দেবী আরাধনার জন্য শুধুমাত্র ত্রি-মাত্রিক মাতৃকা-মূর্তিই অবলম্বন করতেন এমন নয়, প্রয়োজন বোধে চিত্রপটে দেবীমূর্তি এঁকে তাকে পূজা করার পদ্ধতিও সেকালে প্রচলিত ছিল। এটিকে পটচিত্রের অন্যতম দৃষ্টান্ত রূপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অবশ্য 'কাদম্বরী'তে উল্লিখিত এই প্রকার লৌকিক রীতির চিত্রকলার পাশাপাশি নাগরিক মন-সুলভ চিত্রকলার দর্শনও পাওয়া যায়। রাজকুমার চন্দ্রাপীড় যখন বৈশম্পায়নের সঙ্গে রাজভবনে প্রবেশ করলেন, তখন প্রাসাদের আভ্যন্তরীণ রূপ বর্ণনায় বাণভট্ট বলেছেন:

'দেখিলেন, শত শত বলবান দ্বারপাল অস্ত্র-শস্ত্র সুসজ্জিত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছে। দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, কোন স্থানে ধনু, বাণ,

তরবারি প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ অস্ত্রশালা ;···কোনস্থানে বিচিত্র চিত্রশোভিত চিত্রশালিকা শোভা পাইতেছে।'

এই 'চিত্রশোভিত চিত্রশালিকা' যে এ যুগের আর্ট-গ্যালারীরই সগোত্র, এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। আর্ট-গ্যালারী সর্ব অর্থেই নাগরিক মনের প্রকাশ—তবু এই কাহিনীতে চিত্রকলার এই লৌকিক ও নাগরিক রীতির পরস্পর সহাবস্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

চিত্র-রচনার এই নাগরিক রীতির বিবরণ আছে কালিদাসের 'মেঘদূতে'ও। উত্তরমেঘের আট সংখ্যক শ্লোকে কালিদাস প্রাসাদের অলংকরণের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে আছে ঃ

'গগন লগন প্রাসাদ পুরে তোমার মতো মেঘকে নিয়ে
অবাধ গতি বাতাস কভু আসেই যদি পৌঁছে দিয়ে
সিক্ত মেঘের সজল কণা ছড়িয়ে পড়ে তাদের ঘরে
কলংকিত করেই যদি চিত্র কিছু প্রাচীর পরে।'

নরেন্দ্র দেব-কৃত উপরোক্ত অনুবাদে প্রাচীর-চিত্রণের রূপটি বিশেষভাবে সজীব হয়ে উঠেছে।

নিতান্তই নাগরিক মনের প্রকাশ থাকলেও, তৎকালীন লোকচিত্রকলা চর্চার প্রেক্ষিতে এইসব দৃষ্টান্ত নিতান্ত অনুল্লেখ্য নয়। অন্যত্র, কালিদাস বিরহী যক্ষের চিত্রকলা চর্চার কথা বলেছেন :

'ঘুচিয়ে দিতে মনের বিরাগ মোর মালিনীর পড়ছি পায়ে
এই ছবিটি গেরুয়া মাটির আঁচল কেটে গিরির গায়ে
যেদিন গেছি আঁকতে আমি চোখ ভেসেছে অশ্রুজলে
সইবে না কি নিঠুর বিধি রেখার মিলও চিত্রছলে ?

উত্তরমেঘের চুয়াল্লিশ সংখ্যক শ্লোকধৃত এই বিবরণটি যক্ষের চিত্রকলাচর্চার প্রয়াস হলেও, 'হিসাব-ভুল-করা' যক্ষের এই প্রচেষ্টাটি নেহাৎ অদক্ষ হাতের প্রচেষ্টা মাত্র। নতুবা 'গিরির গায়ে গেরুয়া মাটির আঁচড় কাটা' চিত্র কোনদিনই চিত্রকলারূপে স্বীকৃত হবে না—কিন্তু লোকচিত্রকলা রূপে তা' গৃহীত হতে পারে অতি সহজেই।

তবে লোকচিত্রকলার অন্যতম প্রকাশ আলপনার পরোক্ষ নিদর্শন মিলবে

'মেঘদূত'-এ। পূর্বমেঘ অংশের তেত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে 'কুন্তলদের কান্তি ছোঁয়া, গন্ধে উতল ধূপের ধোঁয়া' শীর্ষক অংশে কালিদাস লিখেছেন :

'সুন্দরীদের আলতা রাগে
অলংকৃত পায়ের দাগে
আলিম্পনের চিত্র লেখায়
লক্ষ রমার চরণ রেখায়।'

এখানে আলপনার কথা পরোক্ষে ঘোষিত হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হল যে, কালিদাসের যুগের সুন্দরীরা আলপনা-প্রিয় ছিলেন এবং কখনও কখনও তা' সযত্ন রচিত না হলেও তাদের আলতা-পরা পায়ের ছাপেই অভিনব আলপনা অংকিত হয়ে যেতো।

কিন্তু মেঘকে প্রাসাদ চেনাবার জন্য যক্ষ যে সংকেত চিহ্নের ব্যবস্থা করেছে—তা' যে সত্যই একটি উৎকৃষ্ট লোকচিত্রকলার নিদর্শন—এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রিয়া-সন্নিধানে গমনোদ্যত মেঘের প্রতি যক্ষের সেই অনুরোধ ভাষণটি হল নিম্নরূপ :

'এভিঃ সাধো ! হৃদয-নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষযেরা :
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খ-পদ্মৌ চ দৃষ্টা।'

উত্তর মেঘের উনিশ সংখ্যক শ্লোকে বিধৃত এর মূল কথা হল : 'এই সব লক্ষণের কথা মনে রেখে আর আমার গৃহ-দ্বারের দুই পাশে আঁকা একটি শঙ্খ ও একটি পদ্ম দেখে, আমার গৃহ তুমি চিনে নিতে পারবে।'

এই নিছক গদ্য অংশটি কবি নরেন্দ্র দেবের লেখনীতে রূপ নিয়েছে :

'বন্ধু তুমি চতুর জানি ভুলবে না মোর রাজ্যে কভু,
স্মরণ রেখো সংকেতের এই চিহ্ন কটি, বলছি তবু ;
দ্বারপাশে যার দেখবে আঁকা শঙ্খ-কমল যুগল নিধি
যক্ষপুরে মোর আবাসের জানবে তুমি সেই পরিধি।'

বলা বাহুল্য যে, উক্ত শঙ্খ ও পদ্ম চিহ্ন দেয়াল চিত্রণেরই নিদর্শন। অলকার শৌখীন চিত্রকলা-নিপুণ নারীসমাজ যে দেয়াল চিত্রণে অভ্যস্ত ছিল এটা তারই নিখুঁত ঐতিহাসিক প্রমাণ।

আধুনিক কালে বুদ্ধদেব বসুর লেখনীতে মন্দাক্রান্তার অভিনব প্রয়োগে এই শ্লোকটি যে ভাবে রূপান্বিত হয়েছে :

'অবিস্মরণীয় এসব লক্ষণ, তোমারই হৃদয়ে যা নিহিত,
এবং দ্বারদেশে শঙ্খ-পদ্মের চিত্র দেখে তুমি চিনবে—'

উদ্ধৃত অংশদ্বয়ের তুলনা করা এ' প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবু নরেন্দ্র দেবের মূলকে বিশদীকরণের প্রয়াস এবং পরবর্তী জনের সংক্ষিপ্তকরণের প্রয়াস এখানে অবশ্যই লক্ষ্যণীয়। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় অনুবাদটিই অধিকতর রস-সঞ্চারী।

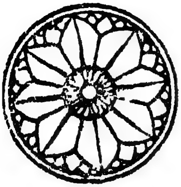

কিন্তু আলোচ্য 'শঙ্খ পদ্ম' চিত্র সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যা' বলেছেন—তা' কিছুটা ভিন্নতর আলোচনার সূত্রপাত করতে পারে। 'মেঘদূত' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

'যক্ষ বেচারা বেশ বড মানুষ। তাহার টাকা কত জানেন, এক কোটি-দু-কোটি নয়, কোটির পর অর্ব্বুদ, অর্ব্বুদের পর বৃন্দ, বৃন্দের পর খর্ব্ব, খর্ব্বের পর নিখর্ব্ব, নিখর্ব্বের পর শঙ্খ, শঙ্খের পর পদ্ম। তার ধন এক পদ্ম আর এক শঙ্খ ১১,০০০,০০০,০০০,০০০। অলকায় চোর ডাকাতের ভয় নাকি একেবারেই নাই। তাই যক্ষের দ্বারে একটি পদ্ম ও একটি শঙ্খ আঁকা থাকে। তাহলেই লোকে জানিতে পারে ইহার কত টাকা। এখন যেমন লিমিটেড কোম্পানীরা তাহাদের মূলধন বিজ্ঞাপনে দিয়া থাকেন, সেকালেও যক্ষেরা এইরূপে তাহাদের বিজার্ভ-ফাণ্ডের বিজ্ঞাপন দিত, শঙ্খ ও পদ্মের পাশে বড় বড় থলে আঁকিয়া সেকালে কেমন করিয়া টাকার পরিমাণ বলিয়া দিত, নতুন যাত্রবে কল্পবৃক্ষের চেহারা দেখিলেই লোকে তাহা বুঝিতে পারিবে। যক্ষ এত ধনের মানুষ।'

শাস্ত্রী মহাশয় রহস্যচ্ছলে যা' বলেছেন, তা আলোচ্য প্রসঙ্গে ততটা প্রয়োজনীয় না হলেও, অন্ততঃ একটা বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারা যায় যে, ঐ শঙ্খ-পদ্মের চিহ্ন যক্ষের ধন-সম্পদের পরিমাণের হোক অথবা তার রোমান্টিক মনের চিত্রকলা-প্রীতির নিদর্শনই হোক—সেগুলি যে তার গৃহের দ্বার-পার্শ্বে আঁকা ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বরঞ্চ এটাকে একটা সাংকেতিক ভাষা বলা যেতে পারে—অনেকটা সেই মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ বা চিত্রাক্ষরের মত। কিন্তু নিছক সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্য না নিয়ে যক্ষ যে চিত্রের সাহায্যে তার পরিচয় ব্যক্ত করেছে, এটাও তো যক্ষের চরিত্রের একটি দিক—সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

চিত্রকলা চর্চার আর এক প্রকরণ হল প্রতিচিত্র অংকন—যাকে আধুনিক

কালের ভাষায় বলা চলে 'পোর্ট্রেট' অংকন। যে যুগে আলোকচিত্র বিদ্যার প্রচলন হয়নি, সে যুগে এ জাতীয় প্রতিচিত্র বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষেত্রে বা নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক অনুরাগ সঞ্চারের ক্ষেত্রে এইসব প্রতিচিত্রের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ' প্রসঙ্গে প্রাচীন সাহিত্য হতে দু'একটি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাক।

'কথাসরিৎ সাগর'-এর দ্বিসপ্ততিতম তরঙ্গে উল্লিখিত 'বিনীত মতির উপাখ্যানে'র অন্তর্ভুক্ত বণিক বিজয়মালীর পুত্র মলয়মালীর বৃত্তান্তে আছে: একদা এই যুবক বণিক ইন্দুযশার কন্যা ইন্দুযশাকে দেখে বিবশ হয়ে পড়ে। তখন—

'তাহাদের এক বন্ধু ছিল, তাহার নাম মন্থরক। সে রাজার চিত্রকর ছিল। সে একদিন আসিয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া গোপনে সেই বিরহাতুরকে জিজ্ঞাসা করিল, বন্ধুর, কি কারণে তুমি চিত্রিতের ন্যায় ভিত্তি-পৃষ্ঠে মগ্ন হইয়া রহিয়াছ? এই ভাবে নানা কথায় বিশেষ উপরোধ করিলে পর মলয়মালী বন্ধুকে নিজের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। তখন বন্ধু তাহাকে বলিল, ভাই, রাজকন্যাকে তোমার মত ব্যক্তির আশা করা উপযুক্ত হয় না।… চিত্রকর এই প্রকার উপদেশ দিলেও যখন তাহাকে সংকল্প-চ্যুত করিতে পারিল না, তখন এক পটে রাজপুত্রীর আকৃতি চিত্রিত করিয়া চিত্তবিনোদনার্থে তাহাকে দিয়া গেল। বণিকতনয় মলয়মালী চিত্রিত রাজকন্যাকে পাইয়া দর্শন, স্পর্শ, অনুনয় ও অলংকরণ করিতে থাকিয়া সময়ক্ষেপ করিতে থাকিল।'

এবং এর পরেও মূল কাহিনীতে ঐ চিত্র কেন্দ্র করে নায়কের উন্মাদ-প্রায় অবস্থার বর্ণনা আছে—আপাততঃ সে প্রসঙ্গ অপ্রয়োজনীয়। প্রকৃত পক্ষে এই কাহিনীতে মানব-চরিত্র ও চিত্র-চরিত্র—দুই-ই সমান্তরাল ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

উপরোক্ত কাহিনীতে নায়িকার চিত্র প্রাধান্য পেলেও 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র কাহিনীতে অনুরূপ ভাবে নায়ক চিত্র-প্রধান কাহিনীও আছে। নবম বেতালের কাহিনীতে আছে, বীরদেব ও পদ্মাবতীর কন্যা অনঙ্গরতি যৌবনে পদার্পণ করলে, তখন তার—

'পিতা যোগ্য বরের নিমিত্ত নাগদেশের রাজপুত্রদের চিত্র আনাইয়া কন্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয় বল।'

এই একই কাহিনী অন্য একটি অনুবাদে আছে, চম্পা নগরীর নরপতি চন্দ্রাপীড় ও তার পত্নী সুলোচনার কন্যা ত্রিভুবন সুন্দরীর যৌবন উপস্থিত হলে :

'কন্যা কালক্রমে বিবাহযোগ্যা হইলে রাজা উপযুক্ত পাত্রের নিমিত্ত অতিশয় চিন্তিত হইলেন। নাগদেশীয় রাজারা ক্রমে ক্রমে অবগত হইলেন, তাঁহারা সকলেই বিবাহ-প্রার্থনায় নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা নিজ নিজ প্রতিমূর্তি চিত্রিত করাইয়া চন্দ্রাপীড়ের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। রাজা মনোনীত করিবার নিমিত্ত সেই সকল চিত্র কন্যার নিকট উপনীত করিতে লাগিলেন।'

কাহিনী দুটি একই, শুধু স্থান-কাল-পাত্র পৃথক। অন্তিম পরিণতিও একই।

দুই

সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রতিচিত্র যে শুধু সংস্কৃত সাহিত্যেই ব্যবহৃত হয়েছে এমন নয়, তুলনামূলক ভাবে আধুনিক কালে বংকিমচন্দ্রও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। স্বভাবতই এখানে তাঁর 'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের সেই বৃদ্ধা তসবীরওয়ালীর কথাই মনে পড়ে। তবে তার চিত্রগুলি ছিল 'হস্তীদন্ত নির্মিত ফলকে লিখিত।' এই পদ্ধতিতে অংকিত চিত্র লৌকিক রীতির অনুসারী কিনা—এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। তবে আলোচনার সুবিধার্থে বলা চলে যে, যে কালে যে দেশে এই ঘটনা ঘটেছে তখন হয়তো এটাই প্রতিচিত্র অংকনের লৌকিক রীতি ছিল। তাছাড়া যে চিত্র বিক্রয়ের স্থল রাজপ্রাসাদে বা সমাজের অভিজাতশ্রেণীতে, সে চিত্র অংকনের মধ্যেও যে কিছুটা আভিজাত্য বা শহর-মনস্কতা থাকবে—এ তো আশাই করা যায়।

তসবীরওয়ালী যে সব ছবি বিক্রী করতে এনেছিল, তার সবিশেষ বিবরণ দিয়েছেন বংকিমচন্দ্র। কিন্তু অংকন এমনই যে :

"প্রাচীনা প্রথম চিত্রখানি বাহির করিলে, এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কাহার তসবীর আয়ি?' প্রাচীনা বলিল, 'এ শাহজাদা বাদশাহের তসবীর।' যুবতী বলিল, 'দূর মাগি, এ' দাড়ি যে আমি চিনি। এ আমার ঠাকুরদাদার দাড়ি।' আর একজন বলিল, 'সে কি লো? ঠাকুরদাদার নাম দিয়া ঢাকিস কেন? ও যে তোর বরের দাড়ি'।

সম্ভবতঃ, অংকন-পদ্ধতির অতি সরলীকরণের জন্যই শুধুমাত্র দাড়ি দিয়ে কোন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা সেই নবীনাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। একমাত্র লৌকিক রীতিতে অংকিত চিত্রতেই এই সরলীকরণ পদ্ধতি দেখা যায়।

এই তসবীরওয়ালারা যে শুধু রঙ্গ রসের বা অবসর বিনোদনের মাধ্যম রূপেই তসবীর বিক্রি করত—এমন নয়। বংকিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখেছেন :

'জেবউন্নিসা একজন প্রধান Politician, মোগলসাম্রাজ্যরূপ জাহাজের হাল এক প্রকার তাঁর হাতে।…জানা আছে 'Politician' সম্প্রদায়ের একটা বড় প্রয়োজন—সংবাদ।··দুর্ম্মুখের মুনিব রামচন্দ্র হইতে বিসমার্ক পর্যন্ত সকলেই ইহার প্রমাণ। জেবউন্নিসা এ কথাটা বিলক্ষণ বুঝিতেন। চারিদিক হইতে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁর কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে তসবীরওয়ালা খিজির একজন। তার মা নানা দেশে তসবীর বেচিতে যাইত। খিজির তাহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন।'

সুতরাং চিত্র বিক্রয় নিছক আনন্দ-বিতরণ নয়—সেকালের রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার একটি ক্ষুদ্র পদ্ধতি ও বলা যেতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নাটক 'মুদ্রা-রাক্ষসে'-র প্রসঙ্গ আসে। এখানেও জনৈক ব্যক্তির যম পট দেখানোর কথা আছে। আলোচনার পরিসরে দেখা যাবে যে 'রাজসিংহে'র চিত্র-বিক্রেতার সঙ্গে উদ্দেশ্যগত ভাবে 'মুদ্রারাক্ষসে'-র এই ঘটনাটির কিছু সাদৃশ্য আছে।

বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে নান্দীমুখের পরেই প্রথম অংকের অন্তর্গত একটি খণ্ড দৃশ্যে রাজপথের পটভূমিতে আছে—'যম-পট হস্তে চরের প্রবেশ'। চর বলছে :

'পণ মহ জমস্স চলনে
কিং কজ্জং দে অ এহিং অন্নিহিং
এসো খু মারেই অন্ন ভত্তানাং চডপডন্তঃ,—ইত্যাদি। নিতান্ত

প্রাকৃত ভাষায় কথিত এই সংলাপটির প্রকৃত বঙ্গানুবাদ হতে পারে : 'যমের চরণে পেন্নাম করো, অন্য দ্যাবতায় কি কাজ ? অন্য দ্যাবতার ভক্তদের ইনি মারেন। তারা ছটফট করে.—ইত্যাদি।

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মার্জিত ভাষায় তা রূপ নিয়েছে এই রকম :

'প্রণম' যমের পদে
অন্য দেবে আমাদের বল কিবা কাজ

অন্য দৈব ভক্তদের
প্রস্ফুরন্ত প্রাণ হরি' লন মহারাজ।
অপিচ :—
থাকিলে যমেতে ভক্তি
দুর্জনেরো হাতে নাহি মরণের ভয়,
সবারে মারেন যিনি
তাঁ হতেই আমাদের প্রাণ রক্ষা হয়।' এই অনুবাদে যম-পট দেখানোর উদ্দেশ্যটা অতি সরল ভাবে ব্যক্ত—অন্ততঃ রাজপথের নাগরিকদের কাছে। কিন্তু চর বিরাধগুপ্তের এই পট-প্রদর্শনের মূল উদ্দেশ্যটা কি, তা প্রকাশ পেয়েছে একটু পরেই :

'চর। ঠাকুর, শুনুন তবে বলি। আমাকে যে আপনি পৌরজনের ভাব চরিত্র জানবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তাই আমি এই যম-পট হাতে করে ঘরে ঘরে প্রবেশ করি, কেউ আমাকে সন্দেহ করতে পারে না।'

অন্য সব পট দেখানো ছেড়ে যম-পট যে সাধারণ মানুষের মনে ভীতি উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ—তা' বিরাধগুপ্তদের জানা আছে। যমের মাহাত্ম্য অপেক্ষা গোপন সংবাদ সংগ্রহের পক্ষে যম-পট তাই সুন্দর অস্ত্র। এই সূত্রেই 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চিত্র-বিক্রেতার সঙ্গে এই পটুয়ার চরিত্রের সাদৃশ্য। পট বা চিত্র প্রদর্শন এখানে নিছক লোকচিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতার নিদর্শন রূপে নয়, কাহিনীর জটিলতা গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এ' প্রসঙ্গে ভবভূতির 'উত্তরচরিতে'র কথা স্মরণযোগ্য। এখানে প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যের একটি প্রসঙ্গ হল :

'লক্ষ্মণ। আর্যের জয় হোক! সেই চিত্রকর আমাদের আদেশ মত এই চিত্রপটে আপনার কার্যগুলির সমস্ত চিত্র করেছে—এই দেখুন।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ, কি উপায়ে সীতা দেবীর মন কষ্ট নিবারণ করতে হয়, তা তুমিই ভাল জান। তা এতে কোন পর্যন্ত চিত্রিত হয়েছে।

লক্ষ্মণ। দেবীর অগ্নিশুদ্ধি পর্যন্ত।

সীতা। সে যা হবার তা' হয়েছে, ও কথায় আর কাজ নেই। এসো এখন চিত্রগুলি দেখা যাক।'

এর পর দ্বিতীয় দৃশ্য উদ্যান-মণ্ডপে। এখানে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা পর্যায়ক্রমে

যে সব চিত্রপট দেখেছেন—তা' হল যথাক্রমে : মন্ত্রপূত জম্ভক অস্ত্রের চিত্র, হরধনু ভঙ্গ, বশিষ্ঠের আশ্রম, চার ভাইয়ের বিবাহের দৃশ্য, ভগবান ভার্গব পরশুরাম, পরশুরাম ও রাম, অযোধ্যায় আগমন, মন্থরা, শৃঙ্গবের পুর, জটাবন্ধন, ভগবতী ভাগীরথী, চিত্রকূট পর্বত, বিন্ধ্যাটবী, জনস্থান অরণ্যের মধ্যবর্তী প্রস্রবণ, পঞ্চবটিতে শূর্পনখা, গৃধ্ররাজ, চিত্রকুঞ্জবন, দণ্ডকারণ্যের অংশ, ঋষ্যমূক পর্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রম, পম্পা সরোবরে হনুমান, মাল্যবান গিরি, কপি-রাক্ষসদের কার্য ইত্যাদি।

এতগুলি চিত্র দেখা ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের জন্য দ্বিতীয় দৃশ্যের সবটাই এ' কাজে ব্যয়িত হয়েছে। হয়তো এগুলি দীর্ঘ জড়ানো (Scroll) পট হতে পারে, নচেৎ পৃথক পৃথক চৌকা পট তো বটেই। তবে পটুয়া নিজে দেখাচ্ছে না, পরিবর্তে দেখাচ্ছে লক্ষ্মণ। বর্ণনা দেখে মনে হয় এ'গুলি অডারী চিত্র। নাটকের ভাব দেখে মনে হয়, চিত্রের সংখ্যা আরো বেশী ছিল। তবে সীতা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন বলে লক্ষ্মণ থেমে গেছেন।

লোকচিত্রকলার আর এক অনুপম নিদর্শন পাওয়া যাবে, কবি বাণভট্ট রচিত অমর গদ্যকাব্য 'হর্ষচরিত'-এ। এখানেও মূলতঃ পটচিত্রের কথাই।

'হর্ষচরিতে'র পঞ্চম উচ্ছ্বাসের নাম : 'মহারাজমরণবর্ণনং'। মহারাজ অন্তিম শয্যায় শায়িত, শ্রীহর্ষ তাঁকে দূর দেশ থেকে দেখতে আসছেন। সেই সূত্রে এসেছে পটুয়ার কথা। প্রবোধেন্দু ঠাকুরের অনুবাদে এই অংশটি হল :

'বিপণী বীথিতে প্রবেশ করলেন হর্ষদেব। তাঁর চোখে পড়ল—যম-পট দেখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক যম পট্টিক।

তার ডান হাতে প্রকাণ্ড শর,

আর বাম হাতে,—ভীষণ মহিষে চড়া প্রেতনাথের এক চিত্তির 'বিচিত্তির ছবি।

নগরের পথের বালকেরা চীৎকার করছে,—'কি হয়েছে কি হয়েছে? দেখছে আর, ভিড় করে ছুটছে। যখন শ্রীহর্ষ তাঁর তুরঙ্গ-সৈন্য নিয়ে যম-পট্টিককে পিছনে রেখে চলে গেলেন, তখন সে ছড়া আওড়াচ্ছে,—

'মাতা পিতৃসহস্রাণি পুত্রদার শতানি চ।
যুগে যুগে ব্যতীতানি কস্য তে কস্য বা ভবান

উদ্ধৃত শ্লোকটির মর্মার্থ প্রবোধেন্দু গ্রন্থের পাদটিকায় দিয়েছেন : 'হাজার হাজার মা আছে, হাজার হাজার বাপ আছে ; ওরে, ছেলে ও মেয়ে আছে ; ওরে, স্ত্রী-ও আছে। যুগের পর যুগ চলে যাচ্ছে, তুই কে, ওরা তোর কে ?'

স্পষ্টতই বাণভট্টের ও বিশাখদত্তের যম-পট্টিকের চরিত্রে একটি পরস্পর-বিরোধী ভাব দেখা যায়। বিশাখদত্ত সেখানে এক শঠ ব্যক্তিকে চিত্রিত করেছেন, যে যম-পট দেখিয়ে বিশেষ ধরণের মনোভাব তৈরী করে কিছু গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে চায়। অপর পক্ষে, বাণভট্ট এমন এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছেন যে যম-পট দেখিয়ে এক বিশেষ ধরণের মনোভাব তৈরী করতে চায়, কিছু গোপন তথ্য তাদের দিতে চায়। সে তথ্য হল জীবন সত্যের নিগূঢ় তথ্য। তাই দ্বিতীয় যম-পট্টিককে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে, অনেকটা শংকরাচার্যের 'কা তব কান্তা……' ইত্যাদি শ্লোকটির কথা মনে পড়ে যায়। তাছাড়া সাহিত্যের বিচারে উভয় ব্যক্তিই প্রাকৃত জন হলেও, বিশাখদত্ত তার মুখে দিয়েছেন চটুল প্রাকৃত ভাষা এবং বাণভট্ট, প্রয়োগ করেছেন গুরু গম্ভীর দার্শনিক শ্লোক—এই পার্থক্যটাও এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর আবহ সৃষ্টির জন্যই বাণভট্টের এই নিপুণ প্রচেষ্টা। কেননা মনে রাখতে হবে যে কাব্যের এই অংশের নাম 'মহারাজমরণবর্ণনং'।

বাণভট্ট শুধু যে পট-চিত্রেরই সার্থক ইঙ্গিত-পূর্ণ প্রয়োগ করেছেন তাঁর কাব্যে—এমন নয়। লোকচিত্রকলার আর এক প্রকরণকে তিনি ব্যবহার করেছেন প্রাসাদের উৎসবময় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। 'হর্ষ চরিতে'র চতুর্থ উচ্ছ্বাসের নাম : 'চক্রবর্তীজন্মবর্ণনং'।এই অংশে রাজশ্রীর বিবাহ উপলক্ষে রাজপ্রাসাদ অলংকরণের জন্য তিনি যে চিত্র দিয়েছেন :

'অলিন্দে অলিন্দে বসে গেল হেমকারদের চক্র ; সোনা পিটিয়ে জিনিষ গড়ছে ; গঠনের টংকার কি বাচাল !

আলেপকরা বালুকা কণ্টকের সঙ্গে বহল মিশিয়ে, সেই প্রলেপ দিয়ে তৈরী করতে লেগে গেল চিত্রাংকনের জন্য নূতন নূতন ভিত্তি।

চতুর চিত্রকরেরা জটলা বেঁধে লিখতে বসে গেল মঙ্গল-আলেখ্য।

সার বেঁধে বসে গেল লেপ্যকার……'

প্রায় দুই পৃষ্ঠা ধরে বাণভট্ট বর্ণনা করে গেছেন লোকশিল্প ও শিল্পীদের রকমারি সম্ভার। আশ্চর্য এই যে, প্রাসাদ অলংকরণের এই বিশদ আয়োজনের

মধ্যে লোকচিত্রকলার কি নিপুণ প্রয়োগ তিনি করেছেন। সেই সঙ্গে তুলে ধরেছেন সেই সব লোকশিল্পীদের মানসিকতাও।

কালিদাস-প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে উত্থাপিত হলেও তাঁর সাহিত্য থেকে চিত্রকলার আর এক নিদর্শন উল্লেখ করা হয়নি। সেটি হল প্রতিচিত্র অংকন—এ' বিষয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হল তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাট্যকাব্য থেকে। নাটকের সুরুতেই নান্দীর পর রাজপথের দৃশ্য এবং সেখানে দুই দাসীর কথোপ-কথন থেকে জানা যাচ্ছে যে :

'দ্বিতীয়া। তুই কোথায় যাচ্ছিস লা ?

প্রথমা। দেবীর কথামত নাট্যাচার্য গণদাসকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি, মালবিকার কতদূর শিক্ষা হল।

দ্বিতীয়া। সখি, তিনি যেখানে থেকে শিক্ষা করেন, সে তো বড় নিকটে নয়। তবে কি করে মহারাজ তাঁকে দেখতে পেলেন ?

প্রথমা। দেবীর চিত্রের পাশে যে চিত্রটি আছে, সেই চিত্রতে তিনি তাঁকে দেখেছেন।

দ্বিতীয়া। কেমন করে ?

প্রথমা। শোন তবে বলি। দেবী যে সময় চিত্রশালায় গিয়ে আচার্য্যের টাটকা রং-করা চিত্রখানি দেখছিলেন, সেই সময়ে সেইখানে মহারাজ এসে উপস্থিত হলেন।

দ্বিতীয়া। তারপর তারপর !

প্রথমা। অভ্যর্থনাদির পর তাঁরা একাসনে দু'জনে বসলেন। তারপর চিত্র-লিখিত দেবীমূর্তির পাশে যে সকল পরিচারিকাদের চিত্র ছিল, তার মধ্যে মালবিকাকে দেখতে পেয়ে মহারাজ দেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন।'

চিত্রে মালবিকাকে দেখে রাজার মনের যে প্রতিক্রিয়া হল, তা নিম্নরূপ। ঐ নাটকের দ্বিতীয় অংকে প্রথম দৃশ্যে (সঙ্গীতশালা) 'আচার্য কর্তৃক প্রত্যাবেক্ষিত হইয়া অঙ্গসৌষ্ঠবা মালবিকার প্রবেশ' হওয়ার পর রাজার মন্তব্য :

'চিত্রেতে হেরিয়া এঁরে
হয়েছিল শংকা এই মনে,
—অমন লাবণ্য কান্তি
মেলে কিনা আসলের সনে।

এসে কিন্তু মনে হয়

—চিত্রকর চিত্র যে আঁকিল

পারেনি আঁকিতে ঠিক,

মনোযোগ হইয়া শিথিল।'

এর পরেও অবশ্য রাজা মালবিকার প্রকৃত রূপ বর্ণনা করেছেন কাব্যিক ভাষায়। সংস্কৃত সাহিত্যের সেটাই নিয়ম—চিত্র অপেক্ষা বাস্তবে নায়িকাকে অতি সুন্দরী হতেই হয় এবং জ্যোতিরিন্দ্রের লেখনীতে সে অনুবাদও হয়েছে উত্তম। তবে নাটকের ঘটনা দেখে মনে হয়, এক্ষেত্রে চিত্রকরটির প্রতিকৃতি অংকনে বোধহয় ততটা দক্ষতা ছিল না। রাজকীয় অর্ডার যারা সাপ্লাই করে তাদের একজনকে দেখা গেছে ভবভূতির 'উত্তরচরিতে'। তার সঙ্গে এর কিন্তু বেশ গুণগত পার্থক্য আছে। কিংবা হয়তো শৈল্পিক কারণেই এ'জাতীয় অপটু চিত্রীর অবতারণা করা হয়েছে।

তিন

পূর্ব-উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি যদি নাগরিক সাহিত্য হয়, এবং সেখানে যদি লোক-শিল্পকলার উপস্থাপন যথাযথ হয়ে থাকতে পারে—তবে আশা করা যায়, লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণেও লোকচিত্রকলার সমৃদ্ধতর প্রকাশ ঘটবে।

আপাততঃ আলপনার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। লোকচিত্র-কলার এই সরল সর্বজনগ্রাহ্য অলংকরণ-মাধ্যমটি গ্রামীণ জীবনকে যেভাবে স্পর্শ করেছে, অন্য কোন উপকরণ বোধ হয় ততটা গুরুত্ব পায় না। দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের জন্যই আলপনার চর্চা এখনও গ্রাম্যজীবনে টিকে আছে—'যেমনটি ঠিক দেখা যেত কালিদাসের কালে'—এ'কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বিভিন্ন মঙ্গল অনুষ্ঠানে এর রূপ কি রকম ছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন লোকগীতির মধ্যেও।

ময়মনসিংহ জেলায় [অধুনা বাংলাদেশ] বিবাহের লোকাচার রূপে নানাবিধ সঙ্গীতের বিশেষ প্রচলন আছে। নানা আচারের সঙ্গে বিবাহ-সঙ্গীত জড়িত—তার মধ্যে একটি হল পানখিল, পানখিলি বা মতান্তরে পানভাঙ্গানি। এই আচার পালনের সময়ে এয়োগণ একত্র হয়ে গান করেন :

'আয়গণে ডাকাইয়া, উঠানখানি লেপাইয়া
লক্ষ্মী আইলা দিলাইন আলিপন।
লক্ষ্মী দিলাইন আলিপন, গঙ্গা আইতে কতক্ষণ।'...ইত্যাদি

ঐ অঞ্চলেই বিবাহ-প্রসঙ্গ ছাড়াও যে আচার বৈদিক, সেই উপলক্ষে যে গান হয়, তার মধ্যে আলপনা দেওয়ার উল্লেখ আছে :

'তোরা উলু দে লো সখিগণ,
নান্দীমুখে বসাইছে রাজন। (ধূয়া)
প্রাতঃস্নান কইর‍্যা রাজা করিলেন আগমন
হেনকালে আইলেন বশিষ্ঠ তপোধন।
যেই ঘরে শুভ কার্য বইসা করিবেন রাজন
বিচিত্র আলিপন দিলা যত সখিগণ।'...ইত্যাদি

এটা প্রধানত নান্দীমুখ অনুষ্ঠানের গান। এই গান সম্বন্ধে দুটি মন্তব্য হল—প্রথমতঃ, শুধু যে লৌকিক অনুষ্ঠান বা ধর্মাচারের সঙ্গে আলপনার যোগ তা নয়, শাস্ত্রীয় ধর্মানুষ্ঠানেও এর প্রয়োগ দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, গায়িকার দল 'বিচিত্র আলপনা দিল যত সখীগণ' বলে গেয়ে গেছেন বটে, কিন্তু কি সেই বিচিত্র আলপনা বা কেমন ভাবে তা' নিষ্পন্ন হল—সে বিষয়ে তারা কিছু বলেননি। এর দুটি কারণ হতে পারে—হয়তো এর ফলে এই আনুষ্ঠানিক গীতিটি আরো দীর্ঘায়িত হত ও তাতে শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্মের বিলম্ব হত, কিংবা আলপনা, বিষয়বস্তু বা রীতি-নীতি মেয়েদের কাছে এতই পরিচিত যে এ' সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ সঙ্গীত রূপে গাইতে তারা তত আগ্রহী নয়।

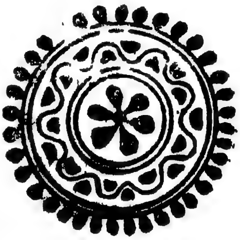

বিবাহ অথবা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও লৌকিক দেব-দেবীর পূজাতেও আলপনা অংকনের একটি গীত হল : 'মাগো মনসা দেবী শংকর দুহিতা'—এইভাবে গানটির সুরু এবং পরে আছে—

'আলিপন চিত্রপট রক্ত পদ্মপাতে।
আতপ তণ্ডুল ক্ষীর ঘৃত মধু তাতে।

স্থানে স্থানে পাতিয়াছে রক্ত পদ্ম পাতে
কুশিয়ারী খণ্ড খণ্ড শোভিয়াছে তাতে ॥'...ইত্যাদি

প্রসঙ্গতঃ এই গীতটি শ্রাবণ মাসে যে মনসার পূজা হয়—সেই উপলক্ষে মেয়েরা গায়।

মুখের এ গান হয়তো একদিন হারিয়ে যাবে। কিন্তু এখনও যে এর কিছু কিছু লিখিত রূপ পাওয়া যায়, 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র অন্তর্ভুক্ত 'কাজলরেখা' পালাটি সে জন্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। একদা এই পালাগান মৌখিক সাহিত্যের পর্য্যায়েই ছিল—কিন্তু আজ তা' মুদ্রিত আকারে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র দীর্ঘ গীতি-কাহিনীগুলি স্বধু অবিভক্ত বাংলাদেশ নয়, ভারতের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিদেশেও যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তবু, লৌকিক জীবনের আখ্যানের সঙ্গে লোকচিত্রকলার একটি বিশেষ প্রকরণ জড়িত থাকায়—এ যাবৎ উল্লিখিত সকল দৃষ্টান্ত অপেক্ষা তা' যেন মহৎ হয়ে উঠেছে।

কাহিনীর শেষাংশে আলপনা অংকনের পরীক্ষার সময়ে গীতিকা-র গায়ক গেয়ে শুনাচ্ছেন :

'উত্তম সাইলের চাউল জলেতে ভিজাইয়া।
ধুইয়া মুছিয়া কন্যা লইল বাঁটিয়া ॥
পিটালি করিয়া কন্যা পরথমে আঁকিল।
বাপ আর মায়ের চরণ মনে গাঁথা ছিল ॥
জোরা টাইল আঁকে কন্যা আর ধানছড়া।
মাঝে মাঝে আঁকে কন্যা গিরলক্ষ্মীর পারা ॥
শিব-দুর্গা আঁকে কন্যা কৈলাস ভবন।
পদ্মপত্রে আঁকে কন্যা লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
হংসরূপে আঁকে কন্যা জয়া-বিষহরী।
ডরাই ডাকুনী আঁকে কন্যা সিদ্ধ বিদ্যাধরী ॥
বনদেবী আঁকে কন্যা সেওরার বনে।
রক্ষাকালী আঁকে কন্যা রাখিতে ভুবনে ॥'

এই ভাবে সমস্ত দেব-দেবীর মূর্তি এঁকে বন্দনা করে—কার্তিক-গণেশ, রাম-সীতা, গঙ্গা-গোদাবরী, হিমালয়, ইন্দ্র-যম, পুষ্পক রথ, সমুদ্র-সাগর, চাঁদ-সূর্য

ইত্যাদি আলপনার মাধ্যমে। তারপরে সর্বশেষে আঁকে :

'ভাঙ্গা মন্দির আঁকে কন্যা জঙ্গলার মাঝে ॥
শেজেতে শুইয়া আছে মরা সে কুমার।
কেবল নাই সে আঁকে ছবি আপনার ॥
সুইচ রাজার ছবি আঁকে পাত্র মিত্র লইয়া।
নিজেরে না আঁকে কন্যা রাখে ভাড়াইয়া ॥
আলিপন আঁইক্যা কন্যা জ্বালে ঘিরতের বাতি।
ভূমিতে লুটাইয়া কন্যা করিল পন্নতি ॥'

উপরোক্ত গীতিকা শ্রদ্ধেয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন সংগ্রাহক দ্বারা সংগৃহীত হয়েছিল—এ' তথ্য আজ আর অবিদিত নেই। কিন্তু পরবর্তী কালে দীনেশ চন্দ্রও স্বয়ং এই সব গীতিকার আশ্রয়ে কিছু আখ্যান রচনা করেছিলেন এবং সেগুলিও বেশ জনপ্রিয় হয়। তাঁর 'বাংলার পুরনারী' গ্রন্থে 'কাজলরেখা' কাহিনীর উপরোক্ত অংশের যে ভাবে রূপদান হয়েছে—তা-ও সৌন্দর্যে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। প্রাথমিক শিল্পীর পক্ষে এই বিবরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর লেখনীতে :

'...মন্ত্রীর উপদেশ মত কাজলকে পরীক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছিল। আর একদিন কোজাগর লক্ষ্মীর পূজা। রাণী ও কংকণ দাসীকে ভাল করিয়া আলপনা আঁকিতে বলা হইল। রাজা বলিলেন, 'আমার বন্ধু আজ আবার আসবেন, আলপনা যত ভাল পার করিবে।'

কাজল সরু শালী ধানের চাউল আগের দিন জলে ভিজাইয়া তাহা বাটিয়া অতি মসৃণ, পিঠালির প্রলেপ তৈরী করিলেন। সর্ব-প্রথম বাপ মায়ের পাদ-পদ্ম আঁকিলেন, উহা তাহার প্রাণে গাঁথা ছিল। তারপরে ধানের গোলা আর ধানের ছড়া আঁকিলেন এবং অবকাশ স্থানগুলি লক্ষ্মীর পদচিহ্ন দ্বারা পূর্ণ করিলেন।

'কৈলাসে শিব-দুর্গার যুগল ছবি, হংস রথে বিষহরি দেবী ও ডাকিনীদের মূর্তি—দিকপ্রান্তে সিদ্ধ বিদ্যাধরী ও বনদেবীর ছবি এবং আরও কত কি আঁকিলেন; সেওরা গাছের নিম্নে বনদেবীর মূর্তি অতি সুন্দর হইল। তারপরে রক্ষা কালীর ছবি,—রাম-লক্ষ্মণ-সীতার মূর্তি চিত্রিত হইল। কার্তিক গণেশ প্রভৃতি কোন দেবতাই বাদ পড়িল না।

'এ সকল অংকন করিয়া কাজলরেখা হিমাদ্রি পর্বত, লংকার পুষ্পক রথ, ইন্দ্র, যম ও তাহাদের আবাস-স্থল, গঙ্গা গোদাবরী প্রভৃতি নদী, সমুদ্রের ঢেউ, চন্দ্র-সূর্যের চিত্র, প্রভৃতি কত ছবিই যে আঁকিলেন তাহার সীমা সংখ্যা নাই।'

এই পর্যন্ত যে বর্ণনা, তা' পুরোপুরি ব্রতকথার নিয়মানুযায়ী আলপনা অংকন। এই অংশটি মূল কাহিনীর থেকে পৃথক করে নিয়ে দেখলেও রস গ্রহণে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। কেন না, অনুভূতিশীল মনে এই বিবরণের একটি শৈল্পিক ও সার্বজনীন তাৎপর্য আছে।

কিন্তু কাজলরেখার কাহিনীতে এই আলপনা অংকনটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। সেটি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই আলপনা অংকনের কোন সার্থকতা নেই। যতক্ষণ না তাকে মূল কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আলপনা অংকন কোন বিশেষ তাৎপর্য পাচ্ছে না। প্রসঙ্গত আলপনা রচনায় এই ভূমিকাটি অনেকাংশেই কবিগানের বা তরজা গানের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। লোকসংস্কৃতির এই দুটি প্রকরণও জনসমক্ষে উপস্থাপনের সময় নানাবিধ দেব-দেবীর বর্ণনা ও বন্দনা করে তারপর গায়ক মূল বিষয়ে প্রবেশ করেন। আসলে শুভ কাজটি যে মাধ্যমে প্রচারিত হবে, তার ভূমিকা বা দেব-বন্দনাটিও সেই মাধ্যমাশ্রয়ী হবে—এটাই হল সাধারণ রীতি। যেমন, আলপনার দেব-বন্দনার পক্ষে মাধ্যম হল আলপনাই এবং কবিগানের পক্ষে কবিগানই।

এইভাবে ভূমিকা রচনার পর কাজলরেখা তার আলপনা রচনার প্রকৃত বক্তব্যে প্রবেশ করলেন। দীনেশ চন্দ্রের ভাষায় তা হল নিম্নরূপ :

'শেষ চিত্র ভাঙ্গা মন্দির। ঘোর অরণ্য এবং মৃত কুমারের চিত্র; কিন্তু কাজল কোন খানেই নিজের ছবি আঁকিলেন না। সূচ-রাজ ও তাঁহার সভাসদদিগের চিত্র এই সুদৃশ্য আলপনা অলংকৃত করিল। অবশেষে ঘৃতের বাতি জ্বালিয়া চিত্রকরী তাঁহার অংকিত আলপনাকে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিলেন।

'নকল রাণীর আলপনা দর্শনান্তর রাজা, তাঁহার বন্ধু ও পারিষদবৃন্দ কাজলরেখার আঁকা ছবি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।'

নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায়, বাংলার সাহিত্যরথীরা যতই লোকসংস্কৃতিপ্রেমিক বলে আত্মপ্রচার করুন না কেন, লোকসংস্কৃতির এই সরল সুন্দর উপকরণটিকে অদ্যাবধি কোন সাহিত্যপ্রেমীই এত নাটকীয় ও সাহিত্যগুণ

ভাবে ব্যবহার করেন নি। লোকসাহিত্যই যে শেষ পর্যন্ত লোকসংস্কৃতির একটি অনুপম নিদর্শনকে কাব্য ও গীতচ্ছন্দে গ্রথিত করে তাকে চিরকালের জন্য অমর করে রাখল—এ' কথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

অনুরূপ আর এক উধৃতি দিয়ে এই সরলতম অলংকরণটির জনপ্রিয়তার কথা বলা যেতে পারে। বাংলার পল্লী-কবি জসীমউদ্দীন-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সোজন বাদিয়ার ঘাট-এ' আছে এই অমূল্য সম্পদটি। কাব্যটির ত্রয়োদশ পর্বে তিনি সোজন-দুলীর ঘর-সংসারের প্রসঙ্গে বলেছেন কাব্যের নায়িকার কণ্ঠে:

'…বেড়ার পানেতে চেয়ে দেখ দেখি, কি এঁকেছি এইধারে!'

এর পর নায়িকা দুলী তার চিত্রকর্মের যে বর্ণনা তার স্বামী সোজনের নিকটে পেশ করেছে—তা' যেন এক আধুনিক আর্ট গ্যালারী। কাব্যচ্ছন্দে এই গ্রাম্য মেয়েটি বর্ণনা করে গেছে—কৃষ্ণ চলেছেন মথুরার পথে, রাবণ রাজার রথ, বেহুলা চলেছেন ভেলায় ভেসে, বনবাসে সীতা, জগন্নাথের পুরী, বৃন্দাবনের মন্দির ইত্যাদি। বিচিত্র তার বর্ণনা ভঙ্গী। এরই মাঝে সে বিরহী রাধা আর বনবাসী সীতার সঙ্গে নিজের অভেদ কল্পনা করে।

কিন্তু তার চেয়েও বিচিত্র চিত্র কবি এঁকেছেন এর পরবর্তী অংশে। দুলীর মুসলমান স্বামী সোজন যখন তাকে বলে:

'সব ত আঁকিলে' সোজন কহিল, 'মুসলমানের পীর।
যদি রাগ করে ? কিছু আঁক নাই তাহাদের কাহিনীর?'

তার উত্তরে স্পষ্ট ঝংকারে দুলী জবাব দিয়েছে:

'চেয়ে দেখ এই ধারে
মক্কার ঘর দাঁড়ায়ে রয়েছে প্রণাম জানাও তারে।
এইখানে দেখ ধূ ধূ বালু উড়ে কারবালা ময়দান,
ফোরাতের কূলে ঢুলিয়া পড়েছে গোধূলির আসমান।
এইখানে এই হোসেনের তাঁবু। পতির মরণ জানি
সখিনা তাহার বিবাহের বেশ ছিঁড়িতেছে টানি টানি।'

এই ভাবে 'কারবালা-কাহিনী' বর্ণনার পর দুলী সোজা চলে এসেছে মজফ্ফর-নারজীর সমাধি জিয়নে। তারপরে:

'আর এইখানে আঁকিয়া রেখেছি শিমুল তলীর গাঁও
আমাদের গাঁর মসজিদ এই সামনের দিকে চাও।'

'নমুদের মেয়ে দুলী' যে ভাবে সোজনকে তার আঁকা চিত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে গেছে তা' শুনলে, মনে পড়ে যায় পটের গানের কথা। কবির এই চিত্রাংকনের হেতু কি তা কিন্তু তিনি প্রকাশ করেননি কোথাও। হিন্দুর ঘরে পূজা উপলক্ষে আলপনা দেওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মুসলমানের ঘরে তো সে উপলক্ষ নেই। তবু কবি এই কাব্যে এক অদ্ভুত সৌন্দর্য সৃষ্টি করে গেছেন—মুসলমানের ঘরে চিত্রাংকন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এ' ধরণের দৃশ্য বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না। একই ব্যক্তির হাতে হিন্দু ও মুসলমান পুরাণ চিত্রিত হয়েছে—সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ' এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

কিন্তু লক্ষণীয় যে কাজলরেখার আলপনা দেবার পদ্ধতির সঙ্গে আলোচ্য কাব্যের নায়িকার একটা প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্য আছে। উভয়েই তাদের বিশদ চিত্রাংকন শেষ করেছে নিজেদের বসত-বাড়ীতে নিয়ে এসে। তবে প্রথম কাহিনীতে তা' যতটা নাট্য-দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে ততটা নয়।

চার

সাহিত্যিকের নাগরিক মন বা নগর মনস্কতার জন্য কখনও কখনও তিনি গ্রামকে ভুলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে, যে স্রষ্টা লৌকিক জীবনের প্রতি দায়বদ্ধ, তিনি শহর বা গ্রাম যেখানকার অধিবাসীই হোন না কেন—লোক-সংস্কৃতি বা তার ঐতিহ্যের প্রতি নির্মোহ থাকতে পারেন না।

তাই রাঢ়-বঙ্গের সার্থক রূপকার তারাশংকরের কথা এখানে উল্লেখ করতেই হয়। লোকসংস্কৃতির অজস্র উপকরণে সমৃদ্ধ তার অসংখ্য গল্প উপন্যাসের কথা বাদ দিলেও, একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে তাঁর লৌকিক জীবনের প্রতি মমত্ব-বোধের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যায়।

এ' প্রসঙ্গে তাঁর 'গণদেবতা' উপন্যাসটির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উদার অর্থে এই উপন্যাসটিকে নির্দ্বিধায় লোকসংস্কৃতির একটি অভিধান বলা চলে। সেই উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট অংশ আলোচ্য প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হবার দাবী রাখে। রাঢ়-বঙ্গের একটি কৃষি-ভিত্তিক অনুষ্ঠান হল 'বাউনী বাঁধা'—পিঠে পার্বণের পর এটি অনুষ্ঠিত হয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি লৌকিক অনুষ্ঠান।

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র পদ্ম-র আর্থিক অবস্থা নিতান্তই দীন। তাই আসন্ন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তার চিন্তা :

'বাড়ীতে আতপ চাল নাই। চাল গুঁড়াইয়া একটি বার বাঁটিয়া লইয়া আলপনার গোলা তৈরী করিতে হইবে। আলপনা আঁকিতে হইবে দরজা হইতে ঘরের ভিতর পর্যন্ত, খামারে মরাইয়ের নীচে গোয়াল ঘরে পর্যন্ত। চণ্ডীমণ্ডপে আবার পৌষ আগলানোর আলপনা আছে। মনে পড়িল, বাউরী চাই। কার্তিক সংক্রান্তির 'মুঠ লক্ষ্মী' ধানের বড় পাকাইয়া সেই ছড়িতে বাঁধিতে হইবে বাড়ির প্রতিটি জিনিষ।'

নিতান্ত দরিদ্র হলেও, কৃষিজীবি পরিবার মাত্রই যে এই অনুষ্ঠান হয়—তা এখানে প্রকাশ। আলপনা সেই অনুষ্ঠানের অন্যতম মাঙ্গলিক চিহ্ন। পদ্ম যদি ধনী ঘরের বউ হত, তবে হয়তো এর জাঁক-জমক আরো বেশী হত—কাজল-রেখার গল্পের মতই। তবু তার দারিদ্র্য তাকে যেখানেই টেনে নামাক না কেন, মাঙ্গলিকের ন্যূনতম প্রক্রিয়াটি পালন করার জন্য তার এই আন্তরিক দুশ্চিন্তাটি একদিকে যেমন তার চরিত্রের একটি বিশেষ দিক খুলে দিয়েছে, অপর দিকে এই সব ব্রতানুষ্ঠান ও মাঙ্গলিক কর্মের প্রতি তার আসক্তিও ঘোষণা করেছে।

'গণদেবতা' উপন্যাসের বহু ক্ষেত্রে এ জিনিষটা লক্ষ্য করা গেছে, যে অনিরুদ্ধ কর্মকার ও তার স্ত্রী পদ্ম অভাব-অনটন ও বঞ্চনার মধ্যে আশাহীন হয়ে পড়েছিল, সেই পদ্মই পৌষ-লক্ষ্মীর ব্রতকথাটি শ্রবণ করে আশান্বিত হয়ে শুরু করল পৌষ-লক্ষ্মীর উদ্যোগ আয়োজন। লেখকের ভাষায় :

'ব্রতকথাটি মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে আশা আকাঙ্খায় বুক বাঁধিয়া পরিতুষ্ট মনেই পদ্ম লক্ষ্মীর আয়োজন আরম্ভ করিল। ঘর দুয়ার খামার হইতে গোয়াল পর্যন্ত আলপনা আঁকিয়া এবার সে যেন একটু বেশী বিচিত্রিত করিয়া তুলিল। দুয়ার হইতে আঙ্গিনার মধ্যস্থল পর্যন্ত আলপনা আঁকিল চরণ-চিহ্ন। ঐ চরণ-চিহ্নে পা ফেলিয়া লক্ষ্মী ঘরে আসিবেন। ঘরের মধ্যস্থলে সিংহাসনের সম্মুখে আঁকিল প্রকাণ্ড

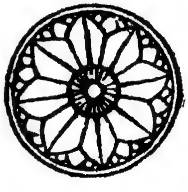

এক পদ্ম। অপরূপ তাহার কারুকার্য। মা আসিয়া বিশ্রাম করিবেন। কত কাজ, কত কাজ। সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আলপনা আঁকিতে বসিল। পৌষ-পৌষ-পৌষ বড় ঘরের মেঝেয় এসে বস—একটি ঘর আঁকিতে হইবে, মরাই আঁকিতে হইবে, 'এস পৌষ বস তুমি, না যেয়ো ছাড়িয়া।'

একটি লৌকিক অনুষ্ঠানের এমন নিখুঁত চিত্রায়ণ বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী নেই। ইতিপূর্বে 'আলপনা' প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে শুধু লক্ষ্মী পূজার প্রসঙ্গে। কিন্তু জীবনের ভিন্নতর কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও তার সার্থক প্রয়োগ—এই দূরদৃষ্টি বোধহয় তারাশংকরের পক্ষেই সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ী' উপন্যাসের কথাও মনে হয়। উপন্যাসটি বহুকাল আগে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হলেও, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় সাম্প্রতিক কালে এবং বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

গিরিবালা দেবীর উপাখ্যানেও লোকচিত্রকলার এই জনপ্রিয় প্রকরণটি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে—অবশ্যই তার পটভূমি লক্ষ্মীপূজা। তাঁর এই নিঁখুত বর্ণনার মধ্য দিয়ে হারানো অতীতের সৌরভ ফিরে ফিরে আসে। উপন্যাসের 'ঠাকুমার' বক্তব্যই শোনা যাক।

'শোন ত পচার বৌ, কাল লক্ষ্মীপুজা, আজ বাড়ীর চারদিক ঝাড-লেপা আরম্ভ করে দে। মা লক্ষ্মী কারোর অনাচার সইতে পারেন না।'

পাছে কেউ অপরিষ্কার স্থানে আলপনা দিয়ে বসে, তাই এর সঙ্গে কৌশলে একটি সংস্কার যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং সেটি হয়েছে ঠাকুমার মুখ দিয়েই। এ সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ:

'আমাদের লক্ষ্মী প্রতিমা নেই—ঘটে-পটে পূজো। আমাকে আলপনায় আঁকতে হয়—লক্ষ্মীর মুখ, জোড়া জোড়া চরণ, ধানের শিষ, পদ্মলতা শংখলতা। আজকে আসন চিত্তির করে রাখতে হয়, কাল হল গোটা বাড়ী, তুলসীতলা, ধামা, কাঠা, ডালা, কুলো, ধানের মরাই, চালের জালার গায়ে লক্ষ্মীর পা আর ধানের শিষ দিয়ে নিয়ম রক্ষা করতে হবে। এ' গাঁয়ে তোর যেমন আলপনার হাত এমনটি আর কারো দেখি নি সরি।'

প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্মী পূজা একটি ঘর-গেরস্থালির অনুষ্ঠান। তাই এর আনুষ্ঠানিক কাজে প্রতিটি পুরনারীরই দক্ষতা থাকা উচিত—অন্ততঃ আলপনা অংকন কার্যে তো বটেই। কিন্তু আলোচ্য প্রসঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে 'সরি' (সরস্বতী) এ' ব্যাপারে বিশেষ অগ্রবর্তী—তার মত আলপনা-শিল্পী বড় বেশী নেই। তাছাড়া শিল্পীর নামটিও এক্ষেত্রে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ,—কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামেই। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে বলতে ইচ্ছা হয়: 'বাঁধা প'ল এক মাল্য-বাঁধনে লক্ষ্মী-সরস্বতী!'

এ' সম্বন্ধে সমালোচক ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান' গ্রন্থে বলেছেন :

'লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য হল এই যে লোকসঙ্গীত যেমন গ্রামের প্রায় সকলেই গাইতে পারে, তেমনি আলপনা যেহেতু একটি লোকশিল্প, তাই গ্রামের সব মেয়েই আলপনা দিতে পারে, তবে এর মধ্যে অনেকেই দক্ষতা অর্জন করে গ্রামের মধ্যে নাম করে। রায়বাড়ীর সরস্বতী আলপনা অংকনে সিদ্ধহস্ত।'

আলপনার নকশা বৈচিত্র্য সম্বন্ধে গিরিবালা দেবী লিখেছেন :

'সরস্বতী অখণ্ড মনোযোগ সহকারে আলপনা দিতেছিল। তাহার ভিতরে শিল্পী সুলভ নৈপুণ্য ছিল অসীম। ধানের শীষ, লক্ষ্মী দেবীর যুগল পদ-চিহ্নের পাশে কত লতা-পাতার অপূর্ব সমাবেশ তাহার আঙ্গুলের ডগায় ফুটিয়া উঠিতেছিল। পদ্মলতা, শঙ্খলতা, তরুলতা, কুঞ্জলতা, জিলেপিলতা, লবঙ্গলতা, ঝুমকালতা —লতায় পাতায় ফুলের চিত্র বিচিত্রতায় ঠাকুমার হাতীমুখো বারান্দার দুই দিক ভরিয়া গেল।'

অতুলনীয় এই বিবরণ উপন্যাস নয়। এ যেন উপন্যাসের চিত্ররূপ রচনার চেষ্টা। এই বিবরণের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থের উল্লিখিত নকশাগুলি মিলিয়ে নিলেই হল।

লক্ষণীয় যে, তারাশংকর বা গিরিবালা উভয়েই তাদের কাহিনীতে আলপনা প্রসঙ্গ এনেছেন ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে। সেই ভিন্নতার মূল সম্ভবতঃ তাদের ব্যক্তি মানসের গভীরেই। পুরুষের বহির্মুখী জীবন ও দৃষ্টি—তাই কৃষি-সংক্রান্ত উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে মানসিক নৈকট্য বেশী হওয়া স্বাভাবিক। অপর পক্ষে গিরিবালা দেবীর জীবন অন্দর-মহলের—নিতান্তই অন্তর্মুখী। তাই তাঁর আলপনা রচনার পটভূমিতে এসেছে লক্ষ্মীপূজা। শুধু তাই নয়, বিশদ বিবরণের ক্ষেত্রেও গিরিবালা দেবীই যে অধিক নিপুণা—এ' কথা স্বীকার করতেই হবে। ব্যক্তি যখন বিশ্লেষণের পটভূমিতে, তখন সেটাই স্বাভাবিক। অবশ্য দৃষ্টান্ত আরো অধিক হলে এ বিষয়ে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হত।

আর এক ভিন্নধর্মী লোকচিত্রকলার নিদর্শন উপস্থিত করা যায় শরৎ-সাহিত্য থেকে। তাঁর 'কাশীনাথ' গ্রন্থভুক্ত 'মন্দির' গল্পটি মূলতঃ এক পুতুল-শিল্পীর গল্প, যে পরবর্তী কালে তার নিজ পরিচয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সন্তান ও পূজারী রূপেই অংকিত হয়েছে। তাঁর ভাষায় :

'শক্তিনাথ এই কুম্ভকার পরিবারের মধ্যে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। রোগক্লিষ্ট ক্ষীণ-দেহ এই ব্রাহ্মণ কুমার তাহার বন্ধু-বান্ধব, খেলা-ধুলা, লেখা-পড়া সব ছাড়িয়া দিয়া এই মাটির পুতলের পানে অকস্মাৎ একদিন ঝুঁকিয়া পড়িল। সে বাঁশের ছুরি ধুইয়া দিত। ছাঁচের ভিতর হইতে পরিষ্কার করিয়া মাটি চাঁচিয়া ফেলিত এবং উৎকণ্ঠিত ও অসন্তুষ্ট-চিত্তে পুতুলের চিত্রাংকন কার্য কেমন অসাবধানতার সহিত সমাধা হইতেছে, তাহাই দেখিত। কালি দিয়া পুতুলের ভ্রূ, চক্ষু, ওষ্ঠ প্রভৃতি লিখিত হইত। কোনটার ভ্রূ মোটা কোনটার আধ খানা কাহারো বা ওষ্ঠের নীচে কালির আঁচড় লাগিয়া থাকিত। শক্তিনাথ অধীর ঔৎসুক্যে আবেদন করিত, সরকার দাদা, অমন তাচ্ছিল্য করে আঁকচ কেন?'

শিল্পের সঙ্গে অসুন্দরের যে বিরোধ তা' এখানে সরল ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই একটি বাক্যেই শক্তিনাথের শিল্পী চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অন্যত্র আছে :

'শক্তিনাথ এক মনে ঠাকুর গড়িতেছিল। পূজা করার চেয়ে ঠাকুর তৈরী করিতে সে অধিক ভালবাসিত। কেমন রূপ, কেমন নাক, কান, চোখ হইবে, কোন রং বেশী মানাইবে এই তাহার আলোচ্য বিষয়।

এ' জাতীয় লোকশিল্পীর বিবরণ আছে রবীন্দ্রনাথের দু' একটি ছোট গল্পেও। তারা পটও আঁকে, কলসীর গায়ে চিত্রনও করে কিন্তু সমাজে কারো কাছে স্বীকৃতি পায় না। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

পাঁচ

লোকসাহিত্য যদি যথার্থই লোকজীবনকে চিত্রিত করে এবং তার মূলধন হয় লোকসংস্কৃতি, তাহলে লোকচিত্রকলার আরো নানা তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন। তার জন্য খুব দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের আবাল্য পরিচিত 'ঠাকুরমার ঝুলি-ঠাকুরদাদার ঝুলি'র দিকে দৃষ্টিপাত করলেই হবে।

বস্তুতঃ, দক্ষিণারঞ্জন এসব গল্প সংগ্রহ করার সময়ে সেগুলি নাকি যথাযথ লিপিবদ্ধ করেন নি—এমন অভিযোগ কোন কোন মহলে করা হয় বটে, সেটা এখানে বিবেচ্য নয়। প্রকাশ ভঙ্গী তাঁর নিজস্ব, প্রকাশ্য বিষয়টা তো তাঁর নয়।

লোকজীবনের অনুপুঙ্খ বিবরণ সম্বন্ধে তিনি যে যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন, তার স্বীকৃতি দিয়েছেন সকলেই।

তাঁর সংগৃহীত ও লিখিত গল্পগুলির মধ্যে একটি গল্প এখানে উল্লেখ করা হল। কাহিনীটি একটু ব্যতিক্রম এ' জন্য যে, এখানে কাহিনীর মধ্যে লোক-চিত্রকলার এক বিশিষ্ট নিদর্শন কি গভীর তাৎপর্য ও নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে—সে সম্বন্ধে নতুন ভাবে দৃষ্টিপাত করা। ছবি দেখে নায়ক-নায়িকার মনে অনুরাগ সঞ্চার আমাদের উপন্যাসে একটি অতি পরিচিত ঘটনা। এই নিবন্ধের বিভিন্ন প্রসঙ্গে তার উল্লেখ হয়েছে। দক্ষিণারঞ্জনের 'কাঞ্চনমালা' কাহিনীতেও এ' প্রসঙ্গ এসেছে এবং ঘটনার প্রতিক্রিয়া হয়েছে যথার্থই সুদূরপ্রসারী। তাঁর ভাষাতেই আছে :

"…তখন কি আনন্দ! লিখন লিখিল তারা বটপাতে।
…লোকজন বলে—'ভাই! পত্র হইল, পট কর।
দুই দলে ছিল বহু 'বাঘা চিত্রকর'
অঙ্গুলি চিরিয়া, পট আঁকিল বিস্তর।
তার মাঝে দুটি পট হল অনুপাম,—
রাখিল সে দুই পট ডাহিন আর বাম।
পলক দেখিতে নারে বলে লোকজন,—

'এ কি চিত্র? —না এ' সত্যই রূপ আর কাঞ্চন?' পট উঠাইতে গিয়া, উঠাইতে কেহ সাহস পায় না।

'শেষে হীরার ঝালর, পাটকাপড়ের ঢাকন দিয়া আবরিয়া দুই দেশের লোক দুই পট তুলিয়া লইল—"ভাই এই পূর্ণিমার পর বিবাহের আসরে দেখা দিব; মালা চন্দন বদল লও, 'মধু মধু' বোল দিয়া আপন আপন ঘোড়া ছাড়।"

'পট নিয়া দুই দেশের লোক, এক দেশের লোক ছিল সওদাগরের হাতে, এক দেশের লোক ছিল — রাজার হাতে।'

কি মাহাত্ম্য পটের, কি গৌরবময় বিবরণ। কাহিনী সপ্তম অধ্যায় পেরিয়ে যেই অষ্টম অধ্যায়ে এসেছে, তখনই সুরু হল পটের কাহিনী—এখানে পট নিজেই যেন হয়ে উঠেছে এক চরিত্র। তারপর আছে :

"সেহি পট দেখে কন্যা খুলে ফেলে বেশ,
রাখিল কাঞ্চন পট, বিছাইয়া কেশ।
পূজিল সুবাস মাখা ফুল থর থর,—
—'এই মোর পতি! পিতা! এই মোর বর।' রাজা লিখন পত্র দিয়া সওদাগরের কাছে লোক পাঠাইলেন।

ওদিকে পট পাইয়া সওদাগর ঢোল দিয়োছেন,—

'কাঞ্চন বরণ কাঞ্চন মালা
পটে করেন শহর আলা,—

সম্মুখের পূর্ণিমায় রূপ সওদাগরের বিয়ে।" এর পর কাহিনী আরো অগ্রসর হয়েছে। পরবর্তী দশম-একাদশ অধ্যায় জুড়ে পটই কাহিনীর নাটকীয় সংঘাত রচনা করেছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে আছে, মাসীর পরামর্শে বোনঝি কি করে পটকে যাদু-মায়া করল। তাই দেখে বৌ ঝি গাইল—

"কয়ো এমন কথা মাসী! ধরি তোমার পায়ে,
পট যার এহি রূপ না জানি সে রূপ কেমন রে।
আমি, কেমন করে আঁচড় দিব মাসী এই পটের গায়ে!
যাঁর রূপের কথা শুনি এরূপ তাঁরি সমান জানি,
আজ আমার সুখের কথা, মাসী! কি কব তোমারে।" এই অধ্যায়েই আছে—সুরূপ চিত্রকে কুরূপ করার কথা, তার জের চলেছে ত্রয়োদশ অধ্যায়েও। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে নকল কন্যার সঙ্গে সওদাগর পুত্রের বিয়ে হয়ে গেল। পরবর্তী চারটি অধ্যায়ে সওদাগরের জীবনের কাহিনী এবং তার দ্বন্দ্ব এগিয়ে গেছে অনেকখানি। কিন্তু বিংশ অধ্যায়ে এসে—

"পদ্মের পাতা ভাসিয়া আসে,—সওদাগর দেখেন,—'না ও কি?...এ কোন স্বর্গের পদ্ম, কোন স্বর্গের পাতা! অপ্সরী কি কিন্নরী—কার যে পট বিচিত্রকরী।"

জলে পট ধুইয়া গিয়াছে,—সেই পটে কাঞ্চনের রূপ, চাঁদ-সূর্য দিক চক্ষু মোহিত করিয়া ফুটিয়াছে।'

বিচিত্র কথা এই যে, দক্ষিণারঞ্জন অসংখ্য রূপকথা সংগ্রহ ও রচনা করেছেন। কিন্তু বাংলার লোকচিত্রকলার এমন অপূর্ব বিবরণ তিনি আর কোথাও রেখে যান নি। সম্ভবতঃ অন্য কোন রূপকথা রচয়িতার লেখনীতেও তা' এত জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। এটি যে নিছক তাঁর লোকচিত্র প্রীতি—এমন নয়, কাহিনীর একটি

প্রয়োজনীয় অংশও। কেননা উক্ত অধ্যায়গুলি বর্জিত বা সংক্ষিপ্ত হলে মূল কাহিনী দানা বাঁধতেই পারত না।

ঠিক এ ধরণের একটি প্রসঙ্গ আছে অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল' গল্পে। এটিও এ' দেশের একটি রূপকথা অবলম্বনে রচিত। 'ক্ষীরের পুতুল' হল পাত্র —তার জন্য পাত্রী নির্বাচন করতে হবে—

'রাজা বানরের কথায় দেশে বিদেশে ভাট পাঠালেন। কত দেশের কত রাজকন্যার সন্ধান এল, একটিও রাজার মনে ধরল না। শেষে পাটুলী দেশের রাজার ভাট সোনার কোটায় সোনার প্রতিমা রাজকন্যার ছবি নিয়ে এল। কন্যার অঙ্গের বরণ কাঁচা সোনা, জোড়া-ভুরু—বাঁকা ধনু দুটি চোখ টানা-টানা, দুটি ঠোঁট হাসি-হাসি, এলিয়ে দিলে মাথার কেশ পায়ে পড়ে। রাজার সেই কন্যা পছন্দ হল।'

এখানেই অবনীন্দ্রনাথ শেষ করেছেন রাজকন্যার পটের বিবরণ—খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু মূল কাহিনীই যেখানে সংক্ষিপ্ত, সেখানে এর বেশী চিত্র অংকন তো সম্ভব নয়। তাছাড়া কাঞ্চনমালার মত, পটচিত্র তো এ' গল্পে কোন অতিরিক্ত নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেনি। এটি একটি প্রথাগত বিষয় মাত্র। তবে কাঞ্চন-মালার পট ও পাটুলী দেশের রাজকন্যার পট বহন করে নিয়ে আসার মাধ্যমগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

এ'কথা ঠিকই, লৌকিক-রীতির চিত্রকলা পদ্ধতিকে যথাযথ মর্য্যাদা দেবার বা তাকে সাহিত্যে রস-সম্মত ভাবে ব্যবহার করার দায়িত্ব যতটা না শহুরে নাগরিক সাহিত্যের, তার চেয়ে বেশী লোক সাহিত্যের। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রসিদ্ধ আপাত সাম্প্রদায়িক উক্তি 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?' বাক্যটি স্মরণ করলে, এ প্রসঙ্গে ঐ উক্তিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে বলতে পারা যায় যে 'লোকশিল্পকে লোকসাহিত্য পোষকতা না করলে কে করবে?'

তাই দীনেশ সেনের 'কাজলরেখা' কিংবা দক্ষিণারঞ্জনের 'কাঞ্চনমালা' বা অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল'কে এ' জন্য ধন্যবাদ জানাতেই হয়।

ছয়

বাংলা সাহিত্যের লৌকিক ধারাটি বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে তার সমৃদ্ধতর প্রকাশ ঘটেছে। এগুলি নিপুণ ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে লোকজীবন

তথা লোকশিল্পকলার একটি সরল চিত্র পাওয়া যাবে। সে ধরণের এক বিচিত্র লোকচিত্রকলার নিদর্শন এখানে তুলে ধরা হল।

দেবী মনসার কাহিনী নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনা করে যারা যশস্বী হয়েছেন, তাদের মধ্যে বাইশ কবি বিজয় গুপ্ত ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ অন্যতম। কিন্তু কবি যশোপ্রার্থী আরো বহু ব্যক্তি এই বিষয় অবলম্বনে কাব্য লিখেছিলেন। তাদের নাম আজ আর শোনা যায় না। হয়তো সাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দু'চার জন উল্লিখিত হয়েছেন। যশোর নিবাসী মাণিকপুর গ্রামের ক্ষমানন্দ দাস যে 'মনসামঙ্গল' লিখেছিলেন, সেখানে তিনি এক বিচিত্র লোকচিত্রকলার বিবরণ দিয়েছেন। 'কাজলা মালিনীর টোপর নির্মাণ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন:

বাসর-ঘর নির্মাণের কাজ শেষ হলে সওদাগর তার পরিচারক নেড়াকে পাঠালেন মালিনীর গৃহে। তার গৃহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর নেড়া মালিনীকে সওদাগরের অভিপ্রায় জানিয়ে তাকে নিয়ে সওদাগরের ভবনে এল। তখন সওদাগর মালিনীকে বলছে:

' .....শুন গো মালিনী মোর কথা।
নখিন্দর পুত্র হেতু নির্মাহ টোপর কেতু,
নানা রত্নে সাজাও সর্বথা ॥'

সওদাগরের নির্দেশ পেয়ে মালিনী টোপর তৈরীর জন্য যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে এল। কবির ভাষায় তার বিবরণ হল:

'চুনি পান্না হীরা মতি, নানা রত্ন আনি তথি,
সাজাইছে টোপর সুন্দর।
ধীর হস্তে তুলি ধরি, নীল বর্ণ যত্ন করি,
নানা চিত্র অঙ্কে তারপর ॥
সদাগর আজ্ঞামতে, চিত্র শিব টোপরেতে,
ভুজঙ্গম মূর্ত্তি নাহি লিখে।'

এর পরেই সুরু হল নাটক। মঞ্চে আবির্ভূতা হলেন দেবী স্বয়ং:

'ধরিয়া ব্রাহ্মণী বেশ, উপনীত অবশেষ,
যথায় মালিনী বিদ্যমান।'

ক্রোধান্বিতা হয়ে দেবী তাকে জানালেন:

'এতদূর স্পর্দ্ধা তোর, এঁকেছ টোপর পর,

চরাচর জন্তু অগণিত।
কার বাক্য শিরে ধরি, সর্প মূর্তি পরিহরি,
অন্য সব কৈলে যে অঙ্কিত ॥
যদি চাহ নিজ হিত, লিখ সর্প সমাহিত,
তবে তোর হইবে কল্যাণ।'

দায়ে পড়ে মালিনী তখন দেবীকে জানাল যে, সে সওদাগরের আজ্ঞায় এ সব করেছে। দেবী যেন তার দোষ না ধরেন। মালিনীর ভক্তিতে খুশী হয়ে দেবী তাকে আশীর্বাদ করলেন। তখন মালিনী :

'সুচিক্কণ তুলি ধরি, নাগমূর্তি চিত্র করি,
অন্তরে ঘুচায় বিষাদ ॥
মুক্তার ঝালর গাঁথা, স্বর্ণ রাগে সুচিত্রিতা,
টোপর লইয়া সুবদনি।
সদাগর ভবনেতে, চলে রামা ত্বরান্বিতে,
সদাগরে অর্পিল তখনি ॥
টোপরের রূপ হেরি, ধন্য ধন্য ধন্য করি,
সদাগর দিল কত ধন।
আনন্দেতে সদাগর, উৎসবে নিরন্তর,
জানে না ত দৈবের ঘটন ॥'

প্রসঙ্গত : উল্লেখযোগ্য, এই টোপর চিত্রন সংক্রান্ত সংবাদ অন্যান্য সকল মঙ্গল কাব্যেই যে পাওয়া যাবে এমন নয়। মূল কাহিনীকে ঠিক রেখে লোককবিগণ নানা শাখা-প্রশাখায় কাব্যটিকে নির্মাণ করেছেন। তাই একটির সঙ্গে অন্যটির হুবহু সাদৃশ্য দেখা যায় না।

টোপর চিত্রনের প্রথা একটি লুপ্ত কলাচর্চা। আধুনিক কালে এর সংবাদ হয় তো গ্রামাঞ্চলেও পাওয়া যাবে না। তেমনই আর এক লোকচিত্রকলার প্রসার হয়েছিল রথের অলংকরণের সময়ে। এ দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে রথের যেমন বহুল ব্যবহার, কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনই রথ-প্রসঙ্গ এসেছে বহুবার। প্রধানতঃ জগন্নাথ দেবের উৎসবে রথ ব্যবহৃত হলেও, পরিবহন মাধ্যম রূপে এর ব্যবহার যে কত বিচিত্র, তার বিবরণ দিয়েছেন তারাপদ সাঁতরা মহাশয় তাঁর 'বাংলার দারু ভাস্কর্য' গ্রন্থে।

এইসব রথের গায়ে প্রধানতঃ দারু ভাস্কর্য থাকলেও, চিত্র কাহিনীতে সজ্জিত করাও একটা প্রথা ছিল। উক্ত গ্রন্থে আছে, হাওড়া জেলার আমতা অঞ্চলের খালনা গ্রামের কৃষ্ণরায় জীউয়ের রথটি তৈরী করেছিলেন গোষ্ট মিস্ত্রী। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে এই রথটি সম্পূর্ণ করতে পারিশ্রমিক বাবদ আটশো টাকা এবং রথের গায়ে চিত্রাংকনের কাজে নিযুক্ত সহকারী শিল্পীর মজুরী বাবদ তিনশত টাকা দেওয়া হয়।

হাওড়া জেলার থলিয়া গ্রামের সূত্রধর শিল্পী পরাণ দাসও একদা চিত্রাংকনে যে পারদর্শী ছিলেন, তার প্রমাণ হল, কলিকাতার চেতলায় নাজিরবাবুর রথের গায়ে উৎকীর্ণ চিত্রাবলী তাঁরই অঙ্কিত।

'বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি' গ্রন্থে অমিয় কুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই অঞ্চলের আর এক শিল্পীর নাম জানিয়েছেন ফকির চন্দ্র দে—'পট আঁকার' কাজেও তিনি সুপটু ছিলেন। কিন্তু তা চৌকা বা জড়ানো (দীঘল) পট নয়; তাঁর অঙ্কন-স্থান নিজের তৈরী রথের কাঠের দেওয়ালের গায়ে। এ হেন একটি রথ কৃষ্ণ-বাটির অদূরে অমরাগড়ি গ্রামে এখনও বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে।

কিন্তু আরো কত রথ-শিল্পীর নাম যে ইতিহাসে হারিয়ে গেছে—তার খোঁজ নেই। তাদের কাজ কখনও বা অভিভূত করেছে কবি-সাহিত্যিকদেরও। পড়ে থাকা সেকালের রথের ভগ্নাবশেষ দেখে তাঁরা লেখেন:

'······ছুতোর ডেকে রঙিন এ' রথ গড়ল পুলকে!
আসল গাঁয়ের বৃদ্ধ পোটো রঙিন তুলির সনে,
রেখায় রেখায় বাঁধল সে কোন সোনার স্বপনে।'

আজ সেই রথের জীর্ণ দশা, ক্রমেই ভেঙে যাচ্ছে, উইপোকা নষ্ট করছে—

'ছবিগুলো যাচ্ছে মুছে ভাঙা কদম ডাল,
ত্যাগ করিয়া পালিয়ে গেছে নিঠুর বংশীয়াল।
তলায় বসে একলা রাধা কাঁপছে পুলকে,
জানতে আজো পায়নি তাহার বন্ধু নিল কে।
মাঠের পথে চলছে ধেনু বিরাম নাহি হায়,
রাখাল কবে ঠ্যাং ভেঙেছে, কেউ না ফিরে চায়।'

এমনতর কত সব টুকরো টুকরো ছবি। ছেলে মেয়েরা দল বেঁধে মাদল, ঢোল, বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। কারোর কাঁধে ভাঙা ঢোল বা একতারা,

ইত্যাদি। এ সবের বিবরণ দিয়ে কবি বলেছেন : 'এমনি কালের কঠোর ঘায়ে দিনের পরে দিন, এ সব ছবির এক খানিরও থাকবে নাকো চিন।'

এ কবিতাটির রচয়িতা হলেন পল্লীকবি জসীমউদ্দীন—তাঁর 'ধানক্ষেত' কাব্যগ্রন্থের 'চৌধুরীদের রথ' থেকে এই উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

রথের গায়ের চিত্র অঙ্কন বোধহয় কবির প্রিয় বস্তু। তাই পরবর্তী কালে তিনি 'ধামরাই রথ' নিয়েও একটি কবিতা রচনা করেন। একদা এই রথটির খুব নাম ছিল বাংলাদেশে। এর প্রাচীনত্ব বেশ উল্লেখযোগ্য : 'ধামরাই রথ', কোন অতীতের বৃদ্ধ সূত্রধর, কতকাল ধরে গড়েছিল এরে করি অতি মনোহর।'

এরপর খুব সংক্ষেপে রথের নির্মাণ-কাহিনী বর্ণনা করে কবি চলে এসেছেন তাঁর প্রিয় বিষয়ে—রথের গায়ের চিত্র বর্ণনায় : 'তারপর এলো নিপুণ পটুয়া, সূক্ষ্ম তুলির ঘায়, / স্বর্গ হতে কত দেবদেবী আনিয়া রথের গায় ; / রঙের রেখার মায়ায় বাঁধিয়া চির জনমের তরে,/মহা সান্ত্বনা গড়িয়া রেখেছে ভঙ্গুর ধরা পরে।'

এরপর দীর্ঘ আঠারো পংক্তি ধরে কবি বর্ণনা করেছেন রথের গায়ের অঙ্কিত দৃশ্যাবলী --প্রসঙ্গতঃ মূল কবিতাটি হল আটচল্লিশ পংক্তির। সুতরাং কবিতাটি রচনার সময়ে তিনি কোন বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা সহজেই অনুমেয়। তাঁর এই দৃশ্য বর্ণনায় আছে—কৃষ্ণের মথুরা যাওয়া, রাধার বিরহ-বেদনা, সীতাহরণ, রাম লক্ষ্মণ ও বানরের দল, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রভৃতি। শিল্পীর নৈপুণ্য সম্বন্ধে কবি বলেছেন : 'অঝোরে ঝরিছে গ্রাম্য পোটোর কয়েকটি রেখা লয়ে'।

এ শুধু চিত্রাংকন নয়—জনশিক্ষাও। তাই কবি উপরোক্ত বিবরণের পরেই বলেছেন : 'এই ছবিগুলি কাঠের রথের লীলায়িত রেখা হতে, / কালে কালে তাহা রূপায়িত হতো জীবনদানের ব্রতে। / নারীরা জানিত এমনি ছেলেরা সাজিবে যুদ্ধ সাজে, / নারী-নির্যাতন কারীদের মহানিধনের কাজে।'—তখনই গ্রাম্য পোটো তার পটুয়ার আসন থেকে শিক্ষকের আসনে উঠে আসেন। জসীমউদ্দীনই বোধ হয় একমাত্র কবি, যিনি এক গ্রাম্য প্রতিভাকে এত বড় সম্মান দিয়েছেন। এ কবিতাটি আছে তাঁর জীবনের শেষ দিকের কাব্য গ্রন্থ 'ভয়ংকর সেই দিনগুলি' গ্রন্থে।

এ দেশের পটুয়া সমাজের যে কত বিচিত্র শিল্প-প্রতিভা ছিল, আলোচ্য উদ্ধৃতিগুলি তার নির্দশন। বাংলার গ্রামাঞ্চলে অনুসন্ধান করলে এখনও হয়তো এ জাতীয় কবিতার মত চিত্রকলার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

সাত

চিত্র সৃষ্টির জন্য রং তুলিই শিল্পীর কাছে শেষ কথা নয়। মানুষ এক শিল্পী, সে সচেতন ভাবে শিল্প সৃষ্টি করে, সে সৃষ্টির মধ্যে থাকে উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য পূরণ হলেই তার শিল্প কর্মের চাহিদা শেষ হয়ে যায় না।

পশ্চিমা শিক্ষাবিদ রুশো একদা বলেছিলেন—প্রকৃতির যা তাই সুন্দর, মানুষ হাত দিলেই তা মলিন হয়ে যায়। আর সঞ্জীবচন্দ্রের সেই বিখ্যাত প্রবাদ-প্রতিম উক্তি 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'—এ তো সেই একই সুর। এত সুন্দর সাজানো কথা গ্রামের মানুষ জানে না। তবে তারা জানে যে 'খোদার ওপর খোদকারী' করাটাও ভাল নয়।

যে সচেতন শিল্পী আলপনা রচনা করে, সে কী জানে, যে তার চেয়েও এক বড় শিল্পী আপন খেয়ালে নিত্য আলপনা এঁকে চলেছেন এই মহাবিশ্বের প্রাঙ্গনে! সেই মহাশিল্পকে যিনি দেখিয়ে দেন—তিনি কি কবি, না তার চেয়েও বেশী কিছু! তাই কবি বলেছেন :

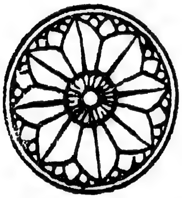

'মটরের ডাল, মসুরের ডাল, কালি জিরা আর ধনে,
লংকা মরিচ রোদে শুখাইছে, উঠানেতে সযতনে।
লংকার রঙ, মসুরের রঙ, মটরের রঙ আর,
জিরা ও ধনের রঙের পাশেতে আলপনা আঁকা কার

এ দৃশ্য যিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তিনি রূপসী বাংলারই কবি—জসীমউদ্দীন। তাঁর 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের ত্রয়োদশ পর্ব হতে এ উধৃতি সংগৃহীত হয়েছে—এই প্রাকৃতিক আলপনা দিয়েই কবি শুরু করেছেন সোজন বেদের কুটিরের সৌন্দর্য।

এমনই এক বিচিত্র অংকন কবি দেখেছেন তদোধিক বিচিত্র এক স্থানে। তাঁর বিখ্যাত 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যের শেষাংশে তিনি গদ্য ভাষায় ভূমিকা লিখেছেন 'রূপাই ফেরার হইয়া চলিয়া গেল। বৌ দিনে দিনে তার অপেক্ষা করিয়া একটি কঁথায় তার বিগত জীবনের সকল কাহিনী আঁকিতে থাকে।

কী সেই আঁকা, তা কবি বলেননি, কিন্তু কী তার মাধ্যম, তা তিনি বলে দিয়েছেন। এ কাহিনী বর্ণনার জন্য তুলি-রং ও সূঁচ-সূতা তার কাছে

সমান হয়ে গেছে। বাস্তবিক, যে দুঃখের কাহিনী রূপাইয়ের বৌ একের পর এক সেলাই করে গেছে,—সে তো এক অভিনব চিত্রই।

রূপসী বাংলার আর এক কবি জসীমউদ্দীনের মতই আমাদের চোখ টেনে নিয়ে গেছেন প্রকৃতির অঙ্গনে। তিনি হলেন 'ওবিন ঠাকুর ছবি লেখে।' তাঁর 'বুড়ো আংলা' শিশু উপন্যাসের নায়ক রিদয়ের চোখ দিয়ে কবি অবনীন্দ্রনাথ আমাদের দেখাচ্ছেন এক বিচিত্র আলপনা। চলন বিলের উপর দিয়ে যেতে যেতে তিনি যা দেখেছেন :

'তখন রিদয়ের চোখ ফুটল। সে বুঝলে সবুজ ছকগুলো ধান-ক্ষেত—নতুন শীষে ভরে রয়েছে। হলদে ছকগুলো খালি জমি, এখনো সেখানে ফসল গজায়নি। রাঙা ছকগুলো শোন আর পাট। সবুজ পাড়-দেওয়া মেটে-মেটে ছকগুলো খালি জমির ধারে ধারে গাছের সার। মাঝে মাঝে বড় বড় সবুজ দাগগুলো সব বন। কোথাও সোনালী, কেথাও লাল, কোথাও ফিকে নীলের ধারে ঘন সবুজ ছককাটা ডোরা টানা, জায়গাগুলো নদীর ধারে, গ্রামগুলি ঘর-ঘর পাড়া-পাড়া ভাগ করা রয়েছে। কতকগুলো ছকের মাঝে ঘন সবুজ, ধারে ধারে খয়েরী রঙ—সেগুলো হচ্ছে আম-কাঁঠালের বাগান—মাটির পাঁচিল ঘেরা, নদী, নালা, খালগুলো রিদয় দেখলে যেন রূপালী ডোরার নক্সা—আলোতে ঝিক্ ঝিক্ করছে। নতুন ফল, নতুন পাতা যেন সবুজ মখমলের উপরে এখানে ওখানে কারচোপের কাজ! —যতদূর চোখ চলে এমনি! আকাশ থেকে মাটি যেন শতরঞ্জি হয়ে গেছে দেখে রিদয় মজা পেয়েছে; সে হাততালি দিয়ে যেমন বলেছে —'বাঃ কি তামাশা।' অমনি হাঁসেরা যেন তাকে ধমকে বলে উঠল,—সেরা দেশ—সোনার দেশ—সবুজ দেশ—ফলন্ত-ফুলন্ত বাংলা দেশ।'

উধৃতিটি একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু এটি যে সত্যই এক অভিনব আলপনা —সেই সিদ্ধান্তে আসতে কবি নিজেই সময় নিয়েছেন। কিন্তু শেষ কালে এসে যখন হাঁসের মুখে শুনিয়ে দেন যে—এটিই সেই বাংলাদেশ, তখন কবি অবনীন্দ্রনাথ আর শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ একাকার হয়ে যান। বাংলা দেশের প্রতিটি গাছ-গাছালী, গ্রাম-ঘর, খেত-খামার যে এক বিচিত্র আলপনার কলকা-পদ্মলতা-পাখী—তা এর আগে আর কেউ এমন করে বুঝিয়ে দেয়নি। এতটুকু 'বুড়ো আঙ্গুলে' রিদয় ছিল বলেই না এই অভিনব দৃশ্য কবি আমাদের কত সহজে দেখিয়ে দিতে পারলেন!

সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে যে সকল খ্যাত অখ্যাত সাহিত্যিক লোকচিত্রকলার নানা নিদর্শনকে এভাবে সাহিত্যসঙ্গত ও সাহিত্যসম্মত ভাবে তাঁদের সৃষ্টির অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন—তাঁরা সবাই গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের ধন্যবাদের পাত্র।

প্রযুক্তিবিদ্যার এই বৈপ্লবিক অগ্রগতির দিনে আজকের সৃষ্টি যখন আগামী কালই নাকচ হয়ে যেতে বসেছে, তখন আলোচ্য শিল্পরীতিগুলি তো সমাজ থেকে কবেই বাতিল হয়ে যাবার কথা। এখনও যে মানব সমাজের এইসব সূক্ষ্ম কারুকর্মের ও তাদের স্রষ্টার কথা মানুষ মনে রাখতে পেরেছে তার কৃতিত্ব প্রাপ্য প্রধানতঃ এই সব সাহিত্যিকদের। তাই প্রকৃত অর্থে আলোচ্য সাহিত্য গ্রন্থগুলি লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল—এ' কথা বলা বোধহয় নিতান্ত অসঙ্গত নয়।

আগামী প্রজন্মের পাঠক হয়তো এইসব গ্রন্থ থেকেই আমাদের দেশের প্রচলিত শিল্প ও চিত্রকলা সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করবে। কিন্তু ক' জনই বা তা' 'কাজলরেখা'র মত অত নিপুণ নাটকীয়তায় সাহিত্য রস-মণ্ডিত করতে পারবে?

তবু যতদিন পর্যন্ত লোকের মুখের কথায় 'পটের বিবি' শব্দটা চলবে, ততদিন হয়তো পট সম্বন্ধে কৌতূহল জেগে থাকবে। কিংবা যতদিন গৃহস্থ লক্ষ্মীপূজার সময়ে আলপনা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করবেন, ততদিন পর্যন্ত এই সুকুমার শিল্পটি কোন গতিকে টিকে থাকবে। আর নাগরিক সভ্যতা তা' ক্ষণে ক্ষণে জলের আলপনা, রক্তের আলপনা ইত্যাদি শব্দে ভূষিত করে এই সরল চিত্রণ পদ্ধতিকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে জটিল করে তুলবে। 'চালচিত্র' তার নিজস্ব রূপ-রীতি ছাড়াও 'পটভূমি' রচনার জন্য প্রতীকী শব্দ রূপে ব্যবহৃত হবে—হয়তো তার মধ্যেই কেউ খুঁজবে চালচিত্রের সেই অংকন রীতি। তবে বাঙালী পরিবারের মায়েদের কল্যাণে লক্ষ্মী প্রতিমা থাকলেও লক্ষ্মীর পটের প্রচলন থাকবে আরো বহুদিন—হয়তো চিরদিনই। আর 'মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা'—কবির এই উক্তিতেই চিত্রিত মঙ্গল কলস আমাদের পুরাতন স্মৃতি জাগিয়ে তুলবে। কিন্তু চিত্রিত ও অলংকৃত বিয়ের পিঁড়ি বোধহয় কোন দিনই লুপ্ত হয়ে যাবেনা সমাজ থেকে—যতই না কোর্ট ম্যারেজ প্রথা প্রচলিত হোক। এ' ভাবেই বেঁচে থাকবে এই সব লৌকিক চিত্রকলা।

আলপনার চিত্র

আলপনা বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে ব্রতের আলপনা, বিভিন্ন ধরণের ও উপলক্ষ্যের আলপনার সংক্ষিপ্ত তালিকা

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ঠানদিদির থলে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৯১১)	বাংলার ব্রত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৪৩)	Alpona Tapan Mohon Chatterji (1948)	Alpana Publicaton Division (India) (1960)	আলিম্পন দুর্গা মুখোপাধ্যায় (১৯৬১)

নীচের সংখ্যাগুলি উপরোক্ত গ্রন্থগুলির পৃষ্ঠাংক নির্দেশক

[ক] বিভিন্ন ব্রত-পূজার আলপনা

		(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	লক্ষ্মী ব্রত ও পূজা	—	১৯	iv, ২৭, ৪১, ৪৩	১০, ২৮-৩১	৩৫, ৪৩ ৪৮
২.	সুবচনী ব্রত	—	৬৩	৪৫	২৭	৩৬
৩.	পৃথিবী ব্রত	২৬৪	৬৪	৩০	—	৩৭
৪.	তারা ব্রত	১৪৯	—	৪৪,৫০,৫৮	—	৩৯
৫.	সাঁজ-পূজনী বা সেঁজুতি ব্রত	৮৮	৫৯	৪০	৬,৩৩,৩৪	৪০
৬.	হরির চরণ ব্রত	৩	—	৫৮	২৫	৪১
৭.	ভাদুলী ব্রত	৩৭,৪১	—	৫৪,৬০	—	৪৭
৮.	মাঘমণ্ডল ব্রত	—	—	৬২	—	৫২
৯.	রণে এয়ো ব্রত	১১,১৩	—	—	—	—
১০.	বসুধারা ব্রত	২২	—	—	—	—
১১.	যমপুকুর ব্রত	৬০	—	—	—	—
১২.	থুয়া ব্রত	১১৯	—	—	—	—
১৩.	ত্রিভুবন চতুর্থী ব্রত	১২৮	—	—	—	—

		(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৪.	ফাগুন-কোণা ব্রত	২১৬	—	—	—	—
১৫.	শংকর ব্রত	২৩৭	—	—	—	—
১৬.	মনসা পূজা	—	—	৪৭	—	—
১৭.	ভাঁজো ব্রত	—	—	৫৬	—	—
১৮.	মুট পূজা	—	—	—	২৫	—
১৯.	সূর্য পূজা	—	—	—	৩০	—
২০.	সত্যনারায়ণ পূজা	—	—	—	৩৭	—

[খ] বিভিন্ন ধরনের আলপনা

		(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	খুন্তীলতা	—	৬৬	৭	—	৪৫
২.	চালতালতা	—	—	২৬	—	৪৫
৩.	কলালতা	—	—	৫,১৫,১৮	—	৪৫
৪.	চিরুনীলতা	—	—	৯,৫১	—	৪৪
৫.	খই লতা	—	—	৯,১৪,২৫,৫১	—	৪৪
৬.	শংখলতা	—	৬৭	৫২	—	৩৮
৭.	ধানছড়া লতা	—	১৭	৩৮	৩২	—
৮.	কলমী লতা	—	১৭,৫৮	৩৮	৩২	—
৯.	দোপাটি লতা	—	১৭	৩৮	—	—
১০.	পৈঁছা লতা	—	—	২৯	—	—
১১.	লক্ষ্মী-চরণ লতা	—	২২,২৩	৩৭	—	—

[গ] বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আল্পনা

		(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	চণ্ডীমণ্ডপের আলপনা	—	৬০	—	—	৫১
২.	বৃক্ষরোপন উৎসব	—	—	—	—	৬৪
৩.	বিয়ের আলপনা	—	—	iii,৫১	৮,৩৫,৩৬	৪২,৬১
৪.	বরযাত্রার পদ্ম	—	৬৫	—	—	—
৫.	অন্নপ্রাশন	—	—	—	—	৩৮
৬.	যে কোন মাঙ্গলিক	—	—	৫১,৫৫,৬০	—	৪৪,৪৭ ৫৩,৬৫

পরিশিষ্ট—২

লোকচিত্রকলা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি

(১৯৫০ সালের পর প্রকাশিত)

(এই তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয়)

বিষয় সংকেত : (১) সম্পূর্ণ গ্রন্থ, (২) গ্রন্থের অংশ (৩) সম্পাদিত গ্রন্থ ও পত্রিকার প্রবন্ধ।

বাঙালীর ইতিহাস/আদিপর্ব। নীহার রঞ্জন রায়। ১৯৫০। ৭৯৯-৮০৭ (১)

Bazar Paintings of Calcutta। W. G. Archer, London। 1953 (১)

কলকাতা কালচার। বিনয় ঘোষ। ১৩৬০ (১৯৫৩)। ১৮২—১৯৯, ২০৭—২১৩ (২)

Folk ritual paintings of Bengal। Sudhir Ranjan Das। 1953 (?) (১)

বাংলার লোকসাহিত্য (১ম)। আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১৯৫৪। ২৩৪—২৪২ (২)

শিল্পচর্চা। নন্দলাল বসু। ১৯৫৭। ৪৮—৭২ (২)

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (অখণ্ড)। বিনয় ঘোষ। ১৯৫৭। ৬৯৩—৭০৪ (২)

চিত্রদর্শন। কানাই সামন্ত। ১৮৮১ শকাব্দ (১৯৫৯)। ৮৫—৯০, ১৬৪—১৬৮ (২)

The Art of Rangoli। T. T. Rele। Hindusthau Standard, 1959, Calcutta (৩)

Alpona। Publication Divisions, Govt. of India। 1960 (১)

বাংলার লোক-শিল্প। কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯৬১। ৪৩—৮০(২)

The Ritual Art of the Bratas of Bengal। Sudhansn Kumar Roy। Calcutta। 1961 (1)

আলিম্পন। দুর্গা মুখোপাধ্যায়। ১৯৬১ (১)

Kalighat Drawings। W. G Archer। ১৯৬২। (১)

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা। আশীষ বসু। ১৯৬২। ১৩—১৪, ১৯—২০(২)

লোকসাহিত্য (২য়)। আশরাফ সিদ্দিকী। ১৯৬৩। ৯৮—৯৯(২)

Designs in Traditional Arts of Bengal। Kalyan Kumar Ganguly। 1963 (1)

A New Document in Indian Painting। Pratapaditya Paul। Journal of Royal Asiatic Society, London। 1965। 103—111(3)

বাংলার পট, পটুয়া ও পটগীতি। জয়ন্ত চক্রবর্তী। দেশ, মাঘ ৮, ১৩৭২ (১৯৬৫) (৩)

আলপনা। বিষ্ণু শর্মা। ১৩৬৭ (১)

পট ও পটুয়া। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। কলাভবন বুলেটিন। বিশ্বভারতী। নভেম্বর ১৯৬৯ (৩)

পূর্ব বাংলার গাজীর পট। আশুতোষ ভট্টাচার্য। ঐ। (৩)

Pop Art and Folk Art। Kanchan Chakraborty। ঐ। (৩)

একটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি ও বাংলার পট। দেবপ্রসাদ ঘোষ। সারস্বত। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬ (১৯৬৯)। ১৫২—১৬১(৩)

উত্তর রাঢ়ের লোকসঙ্গীত। দিলীপ মুখোপাধ্যায। ১৯৭০। ২২—৩১ (২)

পট। আশীষ বসু। ভারতকোষ। ৪র্থ খণ্ড। ১৯৭০। ২৮৬-২৮৭ (৩)

বাঙ্গালার পট। দেবপ্রসাদ ঘোষ। অন্য মনে। চৈত্র ১৩৭৮ (১৯৭১)। (৩)

মেদিনীপুরের চিত্রকর সম্প্রদায ও মাটির পুতুল। তারাপদ সাঁতরা। অন্যমনে। চৈত্র ১৩৭৮ (১৯৭১)। (৩)

আজকের কালীঘাট পটুয়া : সমীক্ষা। ভোলানাথ ভট্টাচার্য। কৌশিকী। শারদীয়া ১৩৭৮ (১৯৭১)। (৩)

Kalighat Paintings। W. G. Archer। 1971 (১)

East Indian Manuscript Paintings। S. K. Saraswati। Chhabi। Golden Jubilee volume। 1971। 248—272। (২)

ক্ষণিকা। যামিনী রায় সংখ্যা। ১৩৭৮ (১৯৭১)। (৩)

বীরভূমের যমপট ও পটুয়া। দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭২ (১)

বাংলার পটকথা। প্রণব রায়। কৌশিকী। ২য় বর্ষ, ৮ম-৯ম সংখ্যা। ১৩৭৯ (১৯৭২)। (৩)

কুমারটুলীর লেখা ও চাল। ভোলানাথ ভট্টাচার্য। কৌশিকী। শারদীয়া ১৩৭৯ (১৯৭২)। (৩)

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি। শংকর সেনগুপ্ত। ১৯৭২। ৪২২—৪৩৬, ৪৪৬ – ৪৪৮ (২)

রূপসী বাংলার চিত্রকর। শোভন সোম। উত্তরসূরি। মাঘ-আষাঢ় সংখ্যা। ১৩৭৮-৭৯ (১৯৭২) (৩)

দেখা হয় নাই। অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৩। ১২-১৫, ৩৫-৫৩ (২)

অন্বিষ্ট। বিশেষ পট সংখ্যা। ১৯৭৩ (৩)

বাংলার লোকসংস্কৃতি। ওয়াকিল আহমদ। ১৯৭৪। ৪০—৯১ (২)

শিল্প ভাবনা। ভোলানাথ ভট্টাচার্য। ১৯৭৫। ৩৩—৬৬ (২)

পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৭৬। ৭২—১০৩ (৩)

মেদিনীপুর জেলার তিনটি গ্রামের পটিদার পাড়া। প্রভাত কুমার দাস। সমকালীন। পঞ্চবিংশ বর্ষ। ফাল্গুন ১৩৮৪ (১৯৭৭)। (৩)

পট-পটুয়াদের ভবিষ্যৎ। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। সমতট ৩৫। জানুয়ারী-মার্চ। ১৯৭৮ (৩)

পাল যুগের চিত্রকলা। সরসী কুমার সরস্বতী। ১৯৭৮ (১)

কাঁথি অঞ্চলের ঝুঁটি বা আলপনা। পূর্ণচন্দ্র দাস। ১৯৭৮। ৪৬—৫৬ (২)

কালীঘাটের পট। কল্যাণী মহাপাত্র। লোকচিত্রকলা। ১ম বর্ষ, শরৎ সংখ্যা। ১৩৮৬ (১৯৭৯)। (৩)

বিষ্ণুপুরী তাস। কল্যাণী মহাপাত্র। লোকচিত্রকলা। ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। ১৩৮৬ (১৯৭৯) (৩)

পট-পুতুলের বাংলা। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৯। ১—২৪। (২)

বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৯। ২০—৩১, ৭২—৭৫ (২)

বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব। বিনয় ঘোষ। ১৩৮৬ (১৯৭৯)। ১১৭—১২৬। (২)

Traditional Art & Crafts of West Bengal। Binoy Ghosh। 1981। 74—86 (২)

পটচিত্র, চলচ্চিত্র ও কমিকস্। শ্রীশ্রীহর্ষ মল্লিক। চিত্রকল্প ২৪। ফেব্রুয়ারী ১৯৮১। (৩)

বাংলার লোকসংস্কৃতি। আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১৯৮২। ১২৪—১২৭ (২)
পট ও পটুয়া প্রসঙ্গে : সমীক্ষা। প্রতিবর্ত গ্রুপ অফ কালচারাল স্টাডিজ।
সংকলন : প্রশান্ত কুমার সেন। প্রতিবর্ত বর্ষ ১, সংখ্যা ১। ১৯৮২। (৩)
হোম। লোকশিল্প বিশেষ সংখ্যা : ৬। মার্চ ১৯৮২ (৩)
বাংলাদেশের লোকশিল্প। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। ১৯৮২। ৯—১৬, ৩৫—৪২ (২)